দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

ফিতনা আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

জুমআর নামায ও জিহাদে ইমাম: একটু বিবেচনা করি..... ৪

মুনাফিকদের একাল-সেকাল ১৬

জিহাদ উত্তম না যিকির উত্তম? ২০

যিকির ও জিহাদ বিষয়ে মুরাবিত ভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট.....২৯

গোলাম-বাঁদি: আল্লাহ তাআলার অনেক বড় রহমত..... ৩৩

কাফের-বেঈমান-যিনদিকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: মাওলানা আবুল বাশার সাহেব উম্মাহকে কিসের সবক দিচ্ছেন? ৩৮

জামাত ও তানজীম গঠন কি বিদআত?.....৪৯

অন্ধ অনুসরণ হতে সাবধান! - শায়খ আবু মুহাম্মাদ আইমান..... ৬৪

গণতন্ত্রের পক্ষে ইসলামি(!!) গণতন্ত্রিদের কিছু কঠিন যুক্তির সহজ জবাব ৬৯

খেলাফত না থাকলে কি অন্য কোন তানজীম করা যাবে না? - একটি সংশয়ের নিরসন ৭৩

জিহাদ না করে যিকির?.....৮০

তায়েফায়ে মানসূরা সম্পর্কে আরো দু'টি কথা..... ৮৪

নির্বাচন: প্রার্থী, ভোট ও ভোটারের শরয়ী বিধান.....৮৮

ইসলামি গণতন্ত্রীদের আরেকটি ধোঁকা ও অলীক কল্পনা :.....৯১

তায়েফায়ে মানসূরা: বিভ্রান্তির নিরসন, বাস্তবতার উন্মোচন..... ৯৫

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও অন্যান্য ১১২

জুমআর নামায ও জিহাদে ইমাম: একটু বিবেচনা করি

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৩-০৬-২০১৮

আমাদের হানাফি মাযহাব মতে জুমআর নামায আদায়ের জন্য স্বয়ং ইমামুল মুসলিমীন বা তার নায়েব বা তার নিয়োগকৃত বা অনুমোদিত ইমাম শর্ত। ইমামুল মুসলিমীনের অনুমতি ছাড়া কেউ জুমআ পড়ালে জুমআ সহী হবে না। এ বিধানটি হানাফি মাযহাবে একটি অতি প্রসিদ্ধ বিধান। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, যদি কোন মুসলিম ভূমি কাফেররা দখল করে নেয়, তাহলে সেখানেও জুমআ কায়েম করতে হবে। মুসলমানরা নিজেরা একজন খতীব নির্বাচন করে নেবে, যিনি তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করবেন। ইমামুল মুসলিমীন না থাকার অজুহাতে জুমআ ছাড়া যাবে না। তদ্রূপ কোন এলাকার পরিস্থিতি যদি এমন দাঁড়ায় যে, সেখানে ইমামুল মুসলিমীন বা তার নিয়োগকৃত কেউ জুমআ পড়াতে সক্ষম নন, তাহলে সেখানকার অধিবাসীরা একজনকে জুমআর ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়ে তার পিছনে জুমআ আদায় করবে।

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وأما السلطان فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه، وقال الشافعي السلطان ليس بشرط؛ ... فأما إذا لم يكن إماما بسبب الفتنة أو بسبب الموت ولم يحضر وال آخر بعد حتى حضرت الجمعة ذكر الكرخي أنه لا بأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلي بهم الجمعة، وهكذا روي عن محمد ذكره في العيون؛ لما روي عن عثمان - ﷺ - أنه لما حوصر قدم الناس عليا - ﷺ - فصلى بهم الجمعة. اهـ

“আমাদের নিকট জুমআ আদায় করার জন্য সুলতান শর্ত। সুলতান বা তার নায়েবের উপস্থিতি ছাড়া জুমআ কায়েম করা জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সুলতান শর্ত নয়। ... হাঁ, ফেতনা কিংবা মৃত্যুর কারণে যদি সুলতান না থাকেন এবং আরেকজন ওয়ালী বা শসনকর্তা এখনো উপস্থিত না হন, এমতাবস্থায়

জুমআর সময় হয়ে যায়- ইমাম কারখী বলেন, জুমআ আদায়ের জন্য লোকজন একমত হয়ে কাউকে নির্ধারণ করে নিতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে এমনটিই বর্ণিত রয়েছে। 'আলউয়ূন' কিতাবে এমনটিই উল্লেখ করেছেন। কেননা, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলেন, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাদের নিয়ে জুমআ পড়িয়েছেন।" **(বাদায়েউস সানায়ে ১/৫৮৮)**

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيبا للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلا وبهذا ظهر جهل من يقول لا تصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكره فتأمل. اهـ

"এজন্যই যদি শাসনকর্তা মৃত্যুবরণ করেন অথবা ফিতনার কারণে উপস্থিত না হতে পারেন এবং এমন কাউকে না পাওয়া যায়, যার জুমআ কায়েমের অধিকার রয়েছে তাহলে জরূরতের কারণে সাধারণ মানুষ নিজেদের জন্য একজন খতীব নির্ধারণ করে নেবে, যেমনটি সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। অথচ এখানে আমীর কিংবা কাযী কেউ-ই নেই। আমাদের এ বক্তব্য থেকে ঐ ব্যক্তির অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা বলে, ফেতনার দিনগুলোতে জুমআ সহীহ হবে না, অথচ ঐ সমস্ত শহরেও জুমআ সহীহ, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে, যেমনটি আমরা সামনে উল্লেখ করব।"**(রদ্দুল মুহতার: ৩/৬)**

বুঝা গেল, জুমআর জন্য যদিও ইমামুল মুসলিমীন বা বা তার নিয়োগকৃত ইমাম শর্ত, কিন্তু তা হলো- যখন যখন ইমাম থাকেন এবং তার সামর্থ্য থাকে। পক্ষান্তরে যদি ইমামই না থাকে (যেমন- দারুল হরবে) কিংবা ইমাম থাকা সত্ত্বেও তার সামর্থ্য না থাকে (যেমন- মুসলমানদের নিজেদের পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়) তাহলে আর ইমাম শর্ত নয়। তখন লোকজনকে নিজেদের জুমআ নিজেদেরকেই আদায় করে নিতে হবে। কারণ, ইমামের শর্ত মূলত শৃঙ্খলার জন্য। যদি ইমাম না থাকে বা ইমামের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই জুমআ আদায় করে নিতে হবে।

এ কারণেই, ইমাম থাকা অবস্থায় যদি ইমাম জুমআ কায়েম না করে কিংবা কায়েম করতে নিষেধ করে- তাহলে লোকজন নিজেরাই জুমআ আদায় করে নেবে। ইমামের আশায় বসে থাকবে না, কিংবা ইমামের নিষেধের কোন পরোয়া করবে না।

ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে,

إذا نهاهم متعنتا أو ضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، كذا في الظهيرية. اهـ

"ইমাম যদি একগুঁয়েমি বশত কিংবা ক্ষতির উদ্দেশ্যে লোকজনকে জুমআ আদায় করতে নিষেধ করে, তাহলে তারা একমত হয়ে একজনকে নির্ধারণ করে নিতে পারবে, যিনি তাদেরকে নিয়ে জুমআ পড়াবেন। ফাতাওয়া জহিরিয়্যাতে এমনই আছে।" **(আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া: ১/১৪৬)**

প্রিয় পাঠক, দেখা গেল- জুমআর নামাযে ইমাম শর্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন ইমাম না থাকবে কিংবা ইমামের সামর্থ্য না থাকবে কিংবা ইমাম জুমআ কায়েম না করবে বা কায়েম করতে বাধা দেবে: তখন লোকজনকে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই পালন করতে হবে। কোন বাহানায় জুমআ তরক করা যাবে না।

প্রিয় পাঠক, এবার আমরা জিহাদের বিষয়ে আসি। জুমআর নামাযে ইমাম শর্ত হওয়ার কথা হানাফি মাযহাবের সব কিতাবেই আছে, কিন্তু জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত এমন কথা কিতাবাদিতে নেই। এতদসত্ত্বে কিভাবে যে সমাজে ছড়িয়ে গেল- জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত; বুঝে আসে না। অধিকন্তু আমরা দেখেছি, ইমাম না থাকলেও জুমআ আদায় করতে হয়। যেখানে ইমাম শর্ত করা হয়েছে, সেখানেও যদি ইমাম না থাকে বা না করে, তাহলে লোকজনকে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকে পালন করতে হয়: তাহলে যেখানে জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত বলে কোন কথাই নেই, সেখানে কিভাবে ইমাম শর্ত হয়ে গেল? সেখানে কিভাবে ইমাম না থাকলে জিহাদ নিষিদ্ধ হয়ে গেল? বড়ই আশ্চর্যের বিষয়!

এক কথায়- শরীয়তের কোন বিধানের জন্যই ইমাম শর্ত নয়। ইমাম শুধু শৃঙ্খলার জন্য। ইমাম না থাকলে বা না করলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই পালন করতে হবে। হুদুদ-কেসাসসহ অন্যান্য বিধানেরও একই বিধান। তবে যেখানে ফিতনার

আশঙ্কা আছে, সেখানে পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। পূর্ণ সামর্থ্য না থাকলে যতটুকু সামর্থ্যে আছে আদায় করবে, বাকিটুকুর জন্য চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহী বুঝ দান করুন। আমীন!

Originally Posted by **salahuddin aiubi**

প্রিয় ভাই! আমি একবার একজন মুফতি সাহেবের সাথে এ বিষয়ে আলাপকালে তিনি খুব দৃঢ়তার সাথে বললেন: জুমআ নামাযের জন্য ইমাম শর্ত হওয়ার কথা হানাফি মাযহাবে নেই। অর্থাৎ কোন কাদীম কিতাবে এটা উল্লেখিত নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. আবু ইউসুফ রহ., মুহাম্মদ রহ. বা যারা হানাফী মাযহাবের মূল ভিত্তি ছিলেন, তাদের কিতাবে এটা পাওয়া যায় না। পরবর্তীদের কিতাবে ভুলভাবে এটা চলে এসেছে। ভাই! আপনি যেসকল কিতাবগুলোর উদ্ধিতি দিলেন, এগুলো তো পরবর্তীদের কিতাব। তো আপনি যদি একটু ঘেটে হানাফি মাযহাবের মৌলিক ও একেবারে প্রথম দিকের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিতেন, তাহলে ভাল হত, যদি থাকে। জাযাকাল্লাহ

যদি জুমআর জন্য আবু হানিফা রহ., আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর নিকট ইমাম শর্ত না হয়ে থাকে, তাহলে এটা থেকে এ কথা তো আর বুঝে আসে না যে, জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত। বরং জিহাদের জন্য যে ইমাম শর্ত নয়, এ কথা হানাফিদের কিতাবাদিতে স্পষ্টই লেখা আছে। আমি আগেও এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছি। তাই সেদিকে আর যাচ্ছি না। তবে আমার জানা মতে হানাফিদের মতে জুমআর জন্য ইমাম শর্ত।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেন,

لا تكون جمعة إلا بإمام. اهـ

“ইমাম ছাড়া জুমআ হবে না।” **(কিতাবুল আছল: ১/৩৬০)**

মুহাম্মাদ রহ. আরোও বলেন,

قلت :أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي؟ قال تجزيهم صلاتهم. اهـ

“আমি আবু হানিফা রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি আমীরের আদেশ ছাড়াই লোকদের নিয়ে জুমআর দিন দুই রাকাআত পড়ে নেয়? তিনি জওয়াব দিলেন, ‘তাদের নামায হবে না। তাদেরকে নতুন করে জোহর পড়তে হবে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমীর তাকে নির্দেশ দিয়ে থাকে, কিংবা ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ যে লোকদের নিয়ে জুমআ পড়েছে) সে আমীরের নায়েব হয়, কিংবা সেনা প্রধান হয়, কিংবা কাযি হয়- তাহলে আপনার কি অভিমত? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তাদের নামায হয়ে যাবে।” **(কিতাবুল আছল: ১/৩৬০)**

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট যে, জুমআ সহী হওয়ার জন্য হয়তো স্বয়ং ইমাম লাগবে, নতুবা তার আদেশকৃত কিংবা নিয়োগকৃত ব্যক্তি (যেমন- নায়েব, সেনা প্রধান বা কাযি) লাগবে।

আরোও দেখুন:

- মুখতাসারুত তহাবী [ইমাম তহাবী রহ. (৩২১হি.): পৃ ৩৪

- মুখতাসারুল কুদূরী [ইমাম কুদূরী রহ. (৪২৮হি.): পৃ. ৫১

- মাবসূতে সারাখসী [শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০হি.)]: ২/৪১

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯১৭১

শহীদ টিপু সুলতান- মুহাম্মদ ইলইয়াস নদভী:

একটি বিষ মিশ্রিত মিষ্ট ফল

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৩-১০-২০১৮

গ্রন্থের নাম: ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর শহীদ টিপু সুলতান

মূল: মুহাম্মদ ইলইয়াস নদভী

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল ফারুক

গ্রন্থটি শহীদ টিপু সুলতান রহ. এর জীবনীর উপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ। একটি মিষ্ট ফল। কিন্তু বিষ মিশ্রিত। আমার কাছে এমনই মনে হল। অন্যদের কাছে অন্য রকম মনে হতে পারে।

বিষ মিশ্রিত হওয়ার কারণ অনেক হতে পারে। এর মধ্যে এটাও একটা হতে পারে যে, লেখক একজন ভারতীয় লোক। তাই টিপু সুলতানকে একজন হিন্দুপ্রেমী সুলতান হিসেবে প্রমাণ করতে না পারলে ভারত সরকারের কাছে তিনি অচ্যুত/অস্পৃশ্য গণ্য হতে পারেন। তখন তার নিজে সহ আরো অনেক মুসলমানের উপর অনাকাঙ্খিক নিপীড়ন আপতিত হতে পারে। তাই লেখক এমনভাবেই গ্রন্থটি লিখেছেন- যাতে ঈমান, তাওহীদ ও সুন্নাহ্ বিসর্জন দিয়ে হলেও টিপু সুলতানকে হিন্দু সম্প্রীতির একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

লেখক যে কারণেই যা করে থাকুক- আমরা তো আর চুপ থাকতে পারি না। কারণ, উম্মাহর কাছে যখন লেখকের লেখাটি পৌঁছবে, তখন তারা তো লেখকের উপর অদৃশ্য কোনো তরবারি যে কোষমুক্ত করে ধরে রাখা ছিল বা আর কি উজরের কারণে, না'কি তার আকিদার বিকৃতির কারণে এমনটা লিখেছেন- সেটা তো আর তাদের কাছে ধরা পড়বে না। উম্মাহ তো এখান থেকে হিন্দুপ্রীতিই শিখবে। আরো যেসব বিকৃতি তিনি ঘটিয়েছেন, উম্মাহ তো সেগুলোকে হক ও ইসলামের শিক্ষা-

উদারতা হিসেবেই নেবে। এমতাবস্থায় আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। লেখক যে ইচ্ছাতেই লিখে থাকুক, আমাদের দায়িত্ব- উম্মাহকে সতর্ক করা।

মূল কথায় যাওয়ার আগে আমাদের জেনে নেয়া দরকার যে, টিপু সুলতান রহ. এর হাতে রাজত্ব এলো কিভাবে? এ বিষয়টা না বুঝলে অনেক বিষয়ই না বুঝা থেকে যাবে। তাই আমি প্রথমে সংক্ষেপে কথাটা একটু বলে নিই।

টিপু সুলতান রহ. এর পিতা হায়দার আলী। তার পূর্বপুরুষ কুরাইশ বংশের মানুষ। মক্কা মুকাররামায় তাদের বসবাস ছিল। সেখান থেকে তারা হিজরত করে হিন্দুস্তানে চলে আসেন। এখানেই হায়দার আলীর জন্ম। হায়দার আলী প্রথমে এক হিন্দু রাজার অধীনে একটি ছোট্ট ফৌজের কমান্ডাররূপে কর্মজীবন শুরু করেন। যোগ্যতাবলে তিনি হিন্দু রাজার সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানে পদোন্নতি করেন। তার ক্রম উন্নতি দেখে অন্যান্য হিন্দুরা ষড়যন্ত্রের জাল বিছায়। তারা রাজাকে কুমন্ত্রণা দেয় যে, হায়দার আলী আপনার রাজত্ব দখল করতে চাইছে। আগে বাগে তাকে দমন করুন। নতুবা পরে বিপদ হবে। রাজা তাদের কথায় কান দেয়। হায়দার আলীকে সুযোগ বুঝে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহর মহিমায় হায়দার আলী ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত হন। তিনি বসে না থেকে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেন। তার অধীস্ত বিশ্বস্ত সৈন্যদের নিয়ে আগে বাগেই রাজধানীতে হামলা করেন। দখল করে ফেলেন রাজধানী। এভাবে হিন্দু রাজার রাজত্ব হায়দার আলীর হাতে এসে পড়ে।

সুস্পষ্ট যে, হায়দার আলীর হাতে যে রাজত্বটি এলো সেটি কোন ইসলামী রাজত্ব নয়। সেখানকার সেনাবাহিনিও মুসলমান সেনাবাহিনি নয়। হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী মিলিয়ে তা গঠিত। কাজেই, এ বাহিনি যারা হায়দার আলীর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেনি। পদবী ও রাজত্বের লোভে যুদ্ধ করেছে বললে, কিংবা স্বাভাবিক গতানুগতিক যুদ্ধের মতো যুদ্ধ করেছে বললে বাড়াবাড়ি হবে না। অতএব, হায়দার আলীর রাষ্ট্র কোন ইসলামী রাষ্ট্র নয়। মুসলমানদের সেখানে একচ্ছত্র ক্ষমতাও ছিল না যে, তারা ইচ্ছা করলে সেটাকে ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন।

অধিকন্তু হায়দার আলী ছিলেন নিরক্ষর মানুষ। সামরিক প্রতিভা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা তার পর্যাপ্ত থাকলেও ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান সম্পর্কে তার জানাশুনা ছিল না। আর তখনকার অন্ধকার যুগে সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি

অবস্থাও কোন ভাল পর্যায়ে ছিল না। বিধর্মীদের সাথে থাকতে থাকতে নিজ ধর্মের নামটা ছাড়া আর তেমন কিছু তাদের বাকি নেই। অধিকন্তু ছিল শীয়াদের দাপট। বিধায় ইসলামের প্রকৃত রূপ তখনকার সমাজ থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। বর্তমান সময়ে দ্বীনে ইসলামের যে চর্চা ও প্রসার তার হাজার ভাগের এক ভাগও হয়তো তখন ছিল না।

তবে হায়দার আলী মুসলমান ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ভালবাসতেন। তাই তিনি যতদূর পেরেছেন ধর্মের কাজ করার চেষ্টা করেছেন। এমতাবস্থায় আমরা তাকে খুব একটা দোষারূপ করতে পারি না যে, কেন তার রাষ্ট্র জাহিলী রাষ্ট্রের ন্যায় পরিচালিত হতো।

হায়দার আলীর রাজত্বলাভ হিন্দুদের সন্তুষ্ট করেনি। মারাঠাদেরও করেনি। তাই তারা বরাবরই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আসছিল। তিনি সেগুলো দমন করে আসছিলেন। আর ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষ গিলে খাওয়ার পায়তারা করছে। তাদের সামনে হায়দার আলী একটা বড় বাধা ছিল। তাই তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিনিও তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন। হায়দার আলী এগিয়েই চলছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছু দিন পরই ইন্তেকাল করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তখনও চলছে।

পিতার মৃত্যুর পর রাজত্বের ভার এসে পড়ে তার সন্তান টিপু সুলতানের হাতে। তিনি রাজত্বের ভার গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ৩৩ বৎসরের মতো।

হায়দার আলী নিরক্ষর হলেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাই তিনি তার সন্তান টিপু সুলতানকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় শিক্ষায়ই শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। এ সুবাধে টিপু সুলতান রহ. একজন আলেম ছিলেন।

তবে আমরা দেখেছি, হায়দার আলীর রাষ্ট্র কোন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না। এখন পিতার মৃত্যুর পর টিপু সুলতান যে রাষ্ট্রের সুলতান হয়েছেন, সেটাও কোন ইসলামী রাষ্ট্র না। তবে তিনি যথাসম্ভব ইসলাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েমের পরিবেশ তখনও ছিল না। কারণ, তার সেনাবাহিনি কোন ইসলামী সেনাবাহিনি নয়। তাছাড়া জনগণও দ্বীনদার নয়।

আমরা জানি যে, হিন্দুস্তানে হাদিসের চর্চা শুরু হয়েছে শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর মাধ্যমে। তাই তখন হিন্দুস্তানে কুরআন-হাদিসের তেমন কোন ইলম ছিল না। হানাফি ফিকহের কিতাবাদি কিছু ছিল। সে অনুযায়ী কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে ইসলাম কায়েমের। অধিকন্তু টিপু সুলতান রহ. যখন রাজত্ব হাতে নেন, তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলমান। আর হায়দার আলীর মৃত্যুর সুযোগে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা বিদ্রোহ করে বসেছে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে। কাজেই তিনি উভয় দিক থেকে যুদ্ধের সম্মুখীন। তখন থেকে নিয়ে শাহাদাতের আগ পর্যন্ত তিনি শুধু যুদ্ধেই লিপ্ত ছিলেন। একটি মাসও শান্তিতে বসে থাকতে পারেননি।

অতএব, টিপু সুলতানের রাজ্য ইসলামী রাজ্য না হওয়ার কয়েকটি কারণ পেলাম:

- তিনি যে রাষ্ট্রের সুলতান হয়েছেন, সেটা অন্যান্য জাহিলী রাষ্ট্রের মতো গতানুগতিক একটা রাষ্ট্র ছিল। কোন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না।

- রাষ্ট্রের সেনাবাহিনি মুসলিম সেনাবাহিনি ছিল না। প্রশাসনিক পদগুলো একচ্ছত্রভাবে মুসলমানদের হাতে ছিল না। বরং সকলের হাতে সম্মিলিতভাবে ছিল। রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদ ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন হিন্দু, মারাঠা, শীয়া ও অন্যান্য বিধর্মীদের হাতে ছিল।

- ইসলামী ইলমের তেমন কোন প্রচার-প্রসার ছিল না। তাই লোকজন ধর্ম সম্পর্কে খুব কমই জানতো।

- সাধারণ মুসলমানরা হাজারো রকমের শিরিক, কুফর ও বিদআতে লিপ্ত ছিল। এমতাবস্থায় তাদের উপর দ্বীন কায়েম করা অতিশয় কঠিন ছিল।

- বিভিন্ন দিক থেকে উপর্যুপরি বিদ্রোহ হচ্ছিল। সুলতান তাদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন।

- ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ চলমান ছিল।

টিপু সুলতান রহ. ইংরেজদের ইসলামের শত্রু মনে করতেন। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তিনি কাদের নিয়ে করেছেন? কোন ইসলামী বাহিনি নিয়ে? না, বরং এমন এক বাহিনি নিয়ে যারা শুধু দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করে। ইসলামের স্বার্থে নয়। অধিকন্তু অন্য সকল রাজ-

রাজারা সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের একনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। এই চতুর্মুখী বিশাল শত্রু বাহিনির বিরুদ্ধে সুলতানকে একা লড়তে হয়েছে। তাই, তার সেনাবাহিনিতে যে সকল বিধর্মী সৈন্য ছিল, তাদের বাদ দিয়ে একচ্ছত্রভাবে মুসলমানদের নিয়ে জিহাদ করা কখনোও সম্ভব ছিল না।

যেহেতু টিপু সুলতানের সেনাবাহিনি ও প্রশাসন ইসলামী ছিল না, তাই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করেছে। অনেকে গোপনে ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে নিয়েছে- বিশেষ করে শীয়ারা, আবার অনেকে পলায়ন করেছে, কিংবা স্বয়ং নিজেরাই সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাই সুলতানের সেনাবাহিনি একটি সুসজ্জতিত ও উন্নত সেনাবাহিনি হওয়া সত্বেও সুলতানকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। তবে তার মনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল। কিন্ত সে সুযোগ তখন তেমন একটা ছিল না। অধিকন্ত প্রচলিত শিরিক-কুফর ও বিদআতের একটা ছাপ যে স্বয়ং সুলতানের উপর পড়েনি, তাও কিন্ত না। তবে তিনি ইসলাম চাইতেন, ইসলামের জন্যই জীবন দিয়েছেন। তাই তিনি শহীদ।

এ কথাগুলো বললাম, সামনের বিষয়গুলো বুঝানোর জন্য:

১.

সুলতানের বাহিনি ও প্রশাসন যে সব ধর্মের সৈন্য নিয়ে গঠিত, সেটা মূলত ধর্মীয় সম্প্রীতি নয়, বরং উজরের কারণে। আর যদি ধরা হয় যে, সুলতানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে তিনি বিধর্মীদের নিয়ে স্বীয় প্রশাসন গঠন করেছেন, তাহলে সেটা গর্বের কিছু নয়। এটা বরং সুস্পষ্ট ইসলামের বিধান লঙ্গন। অতএব, এটাকে আদর্শ হিসেবে পেশ না করে বরং মুসলমানদের কলঙ্ক হিসেবে পেশ করতে হবে।

২.

সুলতানের রাষ্ট্রে যে একচ্ছত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সেটাও কোন গর্বের কথা নয়। যদি সুলতান অক্ষমতার কারণে তেমনটা করে থাকেন, তাহলে তিনি মা'জুর। আর যদি ইসলাম কায়েমে সক্ষম হওয়া সত্বেও সকল ক্ষেত্রে ইসলাম কায়েম না করে থাকেন, সকল বিধান ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা না করে থাকেন, তাহলে সেটাও কোন গর্বের কথা নয় বরং লজ্জার কথা। কাজেই সেটাকে আদর্শ হিসেবে কিংবা ধর্মীয় উদারতা হিসেবে পেশ করার কিছু নেই।

প্রিয় পাঠক, এতক্ষণ যা বললাম, সেটাই বাস্তবতা। কিন্তু গ্রন্থকার এসব বিষয়কে ধর্মীয় সম্প্রীতি, ধর্মীয় উদারতা, ইসলামের মহানুভবতা, ইসলামের আদর্শ- ইত্যাদি হিসেবে পেশ করেছেন।

সুলতানের মহানুভবতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রমাণরূপে গ্রন্থকার এক জায়গায় গর্ব করে বলেন,

"সুলতানের প্রশাসন বা সেনাবাহিনিতে ধর্ম বা বংশের ভিত্তিতে কোটা ছিলো না। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সক্ষমতাই চাকরিতে নিয়োগ ও উন্নতির একক মাপকাঠি বিবেচিত হতো।" পৃ. ৪৮৪

অন্যত্র বলেন,

"ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সব ধর্মের সব অনুসারিদের ভালবাসতেন। সবার প্রতি তার আস্থা ছিল বলেই তিনি প্রশাসনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। সব বিধর্মীকে তিনি পূর্ণ উদারতার সঙ্গে নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধিনতা দিয়েছিলেন।" পৃ. ৪০৭

সামনে গিয়ে লিখেন,

"সুলতান আন্তরিকভাবে হিন্দুদের মন্দির ও সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণরত স্বামীদের শ্রদ্ধা করতেন।" পৃ. ৪০৭

প্রিয় পাঠক, এখানে আমি সমুদ্র থেকে একটা ফোঁটা মাত্র তুলে ধরলাম। নতুবা সারা কিতাবই এমন সব শিরিক, কুফর আর বিদআতে পরিপূর্ণ।

এবার আপনারাই বলুন, এ কিতাব পড়ে কি কেউ তাহওহিদের শিক্ষা পাবে? ওলা-বারার শিক্ষা পাবে? না'কি নাস্তিকতা পাবে?

এ জন্য আমি একে বিষ মিশ্রিত মিষ্ট ফল মনে করি। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এ কিতাব পড়া আমি জায়েয মনে করি না। যারা হক-বাতিল সুস্পষ্ট বুঝেন, তারাই কেবল এ কিতাব পড়তে পারেন।

আরোও দুঃজনক যে, এ কিতাবকে আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অনেকটা তাঁর তত্ত্বাবধানেই এ কিতাব রচিত হয়েছে। আমার মনে হয় না আলী মিয়া নদভী রহ. এমন সব শিরিক কুফরকে

ইসলামের গৌরব বলে প্রচারের অনুমোদন দিয়েছেন। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম! ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯২১৫

মুনাফিকদের একাল-সেকাল

অশ্বারোহী

Senior Membe

০৫-১২-২০১৮

⬇মুনাফিকদের একাল-সেকাল⬆

প্রিয় পাঠক! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে যেমনিভাবে মুনাফিক ছিলো, যারা বিভিন্ন বাহানা ও অজুহাত তালাশ করতো যে, কিভাবে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বাঁচা যায়। তদ্রুপ আজও অনেক লোক রয়েছে যাদের চিন্তা-চেতনা, ওযর-আপত্তি রাসূল (সাঃ) এর যুগের মুনাফিকদের সাথে হুবহু মিলে যায়। আসুন! আমরা এব্যাপারে কিছুটা হলেও জেনে নেই, যেন আমরা এ সকল কপটতাপূর্ণ গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আগত আলোচনা হতে পূর্ণাঙ্গ ফায়দা অর্জন করে মুনাফিক হওয়া থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

রাসূল (সাঃ) এর যুগের মুনাফিকরা যা বলতো

➞১। যখনই তাঁদেরকে বলা হতো চলো জিহাদে বের হই, তো তাঁরা বলতো জিহাদ হচ্ছে ফিৎনা, সুতরাং আমাদেরকে ফিৎনায় ফেলবেন না। ফিৎনা বলে বলে তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়াতো।

বর্তমান যুগের লোকেরা যা বলে!!

☞১। এ সকল লোকদের যখন জিহাদের কথা বলা হয়, তাঁরাও বলে উঠে, জিহাদ হচ্ছে এ যুগের ফিৎনা-ফাসাদ, আজকে যারা জিহাদ জিহাদ করে তাঁদের কারণেই বিশ্বের মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। (নাউযুবিল্লাহ) এভাবেই মুনাফিকরা সর্বযুগে বাস্তবতাকে পুরো উল্টো করে উপস্থাপন করেছে।

এদের ব্যাপারে কোরআন যা বলে

ومنهم من يقول ائذنلي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافري

অর্থঃ তাদের কেউ কেউ বলে, আমাকে জিহাদ থেকে (পিছনে) থাকার অনুমতি দিন! এবং আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না, জেনে রাখুন! তাঁরা তো ফিৎনায় পড়েই রয়েছে। আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এ সকল কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে। (সূরা তাওবাহ-৪৯)

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক! আপনি কি লক্ষ করেছেন? কোরআন তাঁদের কুফুরীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে!!

রাসূল (সাঃ) এর যুগের মুনাফিকরা যা বলতো

→২। যখন স্বয়ং রাসূল (সাঃ) জিহাদের অগ্রসৈনিক, তখনও পর্যন্ত মুনাফিকরা বলতে থকতো-

ان يكن في هذا الزمان قتال كنا من الاقدمين اليه

অর্থাৎ যদি এযুগে সত্যিকার অর্থে কোন কিতাল থাকতো, তবে আমরাই যুদ্ধের প্রথম সারিতে অবস্থান করতাম। (অর্থাৎ তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর উপস্থিতিতে বলতো যে এযুগে সত্যিকার অর্থে কোন কিতাল নেই। (নাউযুবিল্লাহ) যদি থাকতো, তবে এসকল মুনাফিকরা নাকি যুদ্ধের প্রথম সারিতে অবস্থান করতো!! চোরের মায়ের বড় গলা! জিহাদ থেকে পালিযে বাঁচার ফন্দি সবযুগের মুনাফিকরাই এঁটেছিল!

বর্তমান যুগের লোকেরা যা বলে!

☞২। এযুগের কতিপয় লোকেরাও এমনটি বলে থাকে, আবার কেউ কেউ মাশায়েখদের দোহাই দিয়ে জিহাদ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। তারা বলে বেড়ায়, আরে ভাই! অমুক মশায়েখ, মুফতি, মুহাদ্দিস, পীরসাহেব তোমার চেয়ে কম বুঝে নাকি? যদি এযুগে জিহাদ থাকতো, তাহলে এ শায়েখেরা জিহাদ না করে বসে

থাকতোনা। আশ্চর্যের কিছু নেই! রাসূল (সাঃ) এর উপস্থিতিতে যদি মুনাফিকরা এমনটি বলতে পারে, তবে এযুগে বলাটা তো একেবারেই স্বাভাবিক!! তবে আফসোস! সেসব শায়েখদের জন্য যারা জিহাদ না করে বসে থেকে জিহাদের বিরুদ্ধে নিজেকে দলীলরূপে পেশ করছেন। তারা একবারও ভেবে দেখেছেন কি? কেয়ামতে তাঁদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ হতে পারে ?

এদের ব্যাপারে কোরআন যা বলে

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالو لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون

অর্থঃ আর যেন আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন, যারা মুনাফিক তাদেরকে! যখন এসকল মুনাফিকদের বলা হয়, এসো আল্লাহর পথে লড়াই করো, কিংবা প্রতিহত করো শত্রুদেরকে!! (তখন) তারা বলেছিলো- যদি আমরা (এটাকে) কিতাল মনে করতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিলো। তারা নিজেদের মুখে সে কথাই বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে ভালই জানেন, যা তোমরা গোপন করো। (সূরা আলে ইমরান-১৬৭)

দৃষ্টি আকর্ষণ!!

প্রিয় পাঠক! আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, 'কোরআন, তাদেরকে মুনাফিক হওয়ার ফতোয়া দিচ্ছে!!!

রাসূল (সাঃ) এর যুগের মুনাফিকরা যা বলতো

৩।যখন কোন সাহাবী শহীদ হয়ে যেতেন, কিংবা আহত হতেন, বা জিহাদ করতে গিয়ে কোন কষ্ট-ক্লেশে পতিত হতেন, তখন তারা বলতো, তোমাদের কত বলেছি যে যুদ্ধে যেওনা, তাহলেই তো আজকে অমুকে মারা যেতোনা। বিপদে পতিত হতনা। এভাবে নানান কিছু।

বর্তমান যুগের লোকেরা যা বলে

☞৩। এ যুগের মুনাফিক স্বভাবের লোকেরাও ঠিক এমনটিই বলে থাকে। যখন কেউ জিহাদের কাজ করতে গিয়ে কিংবা জিহাদের কথা বলে বন্দি হয়, তখন তারা বলে – তোমাকে কতবার বলেছি এসব করার প্রয়োজন নেই। এখন জেলের ভাত খাও, আর বুঝ কত মজা!!

📝এদের ব্যাপারে কোরআন যা বলে

الذين قالو لاخوانهم لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقي🌿

🌿অর্থঃ ওরা হলো সেসব লোক, যারা নিজেরা (জিহাদ ছেড়ে) বসে থাকে আর তাদের ভাইদের ব্যাপারে (যারা যুদ্ধে গিয়েছে) সমালোচনা করে বলে, যদি তাঁরা আমাদের কথা শুনতো, তাহলে নিহত হতোনা। (হে রাসূল সাঃ) আপনি তাঁদেরকে বলে দিন, (পারলে) তোমরা তোমাদের থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা আলে ইমরান-১৬৮)

🖋দৃষ্টি আকর্ষণ

🌹প্রিয় পাঠক! এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের আরো একটি চরিত্র প্রকাশ করে দিলেন এবং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন যে, তোমরা যদি তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও, তাহলে মৃত্যু ঠেকাও! আর এটা তোমরা কখনোই পারবেনা। অতএব তোমরা তোমাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৭৮৬

জিহাদ উত্তম না যিকির উত্তম?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-১৫-২০১৮

তিরমিযি শরীফের একটি হাদিস নিয়ে এক ভাই দ্বিধাদ্বন্ধে ছিলেন। হাদিসের তরজমা তিনি এই উল্লেখ করেছিলেন,

"আবূদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিকরের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।"

মূল হাদিসটি (সুনানে তিরমিযি: ৩৩৭৭) এই-

عن أبي الدرداء ﷺ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى، قال: ذكر الله تعالى. فقال معاذ بن جبل ﷺ :ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله

ভাইয়ের পেরেশানীর কারণ সম্ভবত এই যে, এ হাদিসে যিকিরকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে, অথচ জিহাদের ফজিলত সীমাহীন। অধিকন্তু এ হাদিসকে কেন্দ্র করে যিকিরপন্থীরা জিহাদ তরকের বাহানা খোঁজবে। ইনশাআল্লাহ আমি হাদিসটির সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, কোন আমলের ফজিলত বেশি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অন্য সকল ফরয-নফল বাদ দিয়ে এটাতেই লিপ্ত থাকতে হবে। এমনটা মনে করা সুস্পষ্টই গোমরাহি। যেমন ধরুন- নামাযের ফজিলত অনেক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সারাক্ষণ শুধু নামাযেই ব্যস্ত থাকবে; হজ্ব করবে না, যাকাত দেবে না, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেবে না... ইত্যাদি। বরং যার উপর যে যে বিষয় ফরয তাকে তা আদায় করতে হবে। ফরয দায়িত্ব আদায়ের পর বা পাশাপাশি অন্যান্য আমল করতে কোন অসুবিধা নেই। যে যত আমল করবে তার তত প্রতিদান মিলবে।

জিহাদ ও যিকিরের ক্ষেত্রেও একই কথা। যিকিরের ফজিলত যদি জিহাদের চেয়ে বেশিও হয়ে থাক, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, ফরয জিহাদ ছেড়ে যিকিরে মশগুল থাকবে। এটা তখন ফরয নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত ছেড়ে যিকিরে মশগুল থাকার মতোই হবে। বরং যিকিরের ফজিলতের অর্থ: নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত-জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি ফরয আদায়ের পাশাপাশি যিকিরেরও পাবন্দি করবে। ফরয ছেড়ে যে যিকিরে লিপ্ত থাকবে সে গোমরাহ হওয়ার ব্যাপারে আশাকরি কারো দ্বিমত নেই। ফরয জিহাদ ছেড়ে খানকাহ ও যিকির মশগুল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা।

দ্বিতীয়ত: আমলের সওয়াব তার কষ্টের ভিত্তিতে নয়, আমলের মর্যাদা হিসেবে। যে আমলের মর্যাদা বেশি তার সওয়াবও বেশি- যদিও তা সহজ হয় আর অন্যগুলো কঠিন হয়। যেমন- ঈমান আনা অনেক সহজ কাজ। কিন্তু এর প্রতিদান অন্য সকল আমলের চেয়ে বেশি। নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত-জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি সকল আমলের চেয়ে ঈমানের প্রতিদান বেশি, অথচ এসবগুলোর তুলনায় ঈমান সহজ। এ বিষয়টি ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম রহ. পরিষ্কার আলোচনা করেছেন তার [ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম] কিতাবে। এক পর্যায়ে তিনি বলেন,

ومما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات ... والحاصل بأن الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف. اهـ

“সকল ইবাদতে সওয়াবের পরিমাণ যে কষ্টের ভিত্তিতে নয় তার দলীল- এরপর তিনি উপরোক্ত হাদিসসহ যিকির সংক্রান্ত আরো হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর

বলেন- সারকথা: সওয়াব নির্ধারিত হয় আমলের মর্যাদার কম বেশ এর ভিত্তিতে।" (ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম: ১/৪৮)

অতএব, কোন আমলের মর্যাদা বেশি হলে তার সওয়াবও বেশি- যদিও তা অন্যান্য আমলের চেয়ে অনেক সহজ হয়। আর কোন আমলের মর্যাদা কম হলে তার সওয়াবও কম- যদিও তা অন্যান্য মর্যাদাবান আমলের চেয়ে কষ্টসাধ্য হয়।

এবার আমরা আলোচ্য হাদিসে আসি।

এ হাদিসে আল্লাহ তাআলার যিকিরকে ইনফাক তথা যাকাত, দান-খায়রাতসহ অন্য সকল আর্থিক ইবাদাতের চেয়ে এবং জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। এখানে যিকির দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

দু'টি উদ্দেশ্য নেয়া যায়:

১. কলবি যিকির। তথা সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার ইয়াদ ও নিয়তের পরিশুদ্ধি। যদি এমনটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে স্পষ্ট যে, পরিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কোন আমলই সহীহ না। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি কোন কিছুই পরিশুদ্ধ ও খালেছ নিয়ত ছাড়া সহীহ না। খালেছ নিয়ত ছাড়া সওয়াব পাওয়া যায় না। তদ্রূপ, আল্লাহ তাআলার ইয়াদ ছাড়া শুধু ভাসা ভাসা আমলের দ্বারাও তেমন সওয়াব পাওয়া যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তাআলার যিকির অন্য সকল আমল হতে উত্তম হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণেই হাদিসে মু'মিনের নিয়তকে তার আমলের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। কাযি ইবনুল আরাবী রহ. এমনটিই বলেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح الا والذكر مشترط في تصحيحه فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية ويشير إلى ذلك حديث نية المؤمن ابلغ من عمله اهـ

"কাযি আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. এ হাদিসের এই জওয়াব দিয়েছেন যে, প্রতিটি নেক কাজ সহীহ হওয়ার জন্য যিকির শর্ত। যে ব্যক্তি- উদাহরণস্বরূপ- তার

সাদাকা বা তার রোযা আদায়ের সময় অন্তরে আল্লাহ তাআলাকে ইয়াদ না করবে, তার আমল কামেল নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যিকির (তথা আল্লাহ তাআলার ইয়াদ) সর্বোত্তম আমল। হাদিস: 'মু'মিনের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম'- এ দিকেই ঈঙ্গিত করে।" (ফাতহুল বারি: ১১/২১০)

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিছক মৌখিক যিকির জিহাদ ও অন্যান্য আমল থেকে উত্তম সাব্যস্ত হয় না। আর যিকির যদি বিদআতি যিকির হয, তাহলে তো উত্তম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪হি.) এ হাকিকতটিই তুলে ধরেছেন। তার যামানার জাহেল সুফিদের খণ্ডনকল্পে আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

المراد من هذا: هو الذِّكر القلبي ... لا الذِّكر اللِّساني المشتمل على صياحٍ وانزجاعٍ، وشدةِ تحريكِ العنقِ واعوجاجٍ، كما يفعله بعض الناس زاعمين أن ذلك جالبٌ للحضور، وموجبٌ للسرور، حاشا لله، بل هو سبب للغَيبة والغرور. اهـ

"এখানে যিকির দ্বারা কলবি যিকির উদ্দেশ্য ... মৌখিক যিকির উদ্দেশ্য নয়, যে যিকিরে থাকে চিল্লা-ফাল্লা আর হৈ-হুল্লোর, জোরে জোরে ঘাড় নাড়ানো আর বক্র অঙ্গভঙ্গি। যেমনটা কতক লোক করে থাকে। মনে করে- এমন করলে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও অন্তরের প্রশান্তি অর্জন হবে। আল্লাহর পানাহ। কিছুতেই না। এসব বরং আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরা ও প্রবঞ্চনার কারণ।" (শরহু ইবনিল মালাক আলাল মাসাবিহ: ৩/৯২)

২. দ্বিতীয়ত যিকির দ্বারা যেকোন যিকির উদ্দেশ্য নয়, বরং কামেল যিকির উদ্দেশ্য। আর তা হবে আল্লাহ তাআলার আযমত ও ইস্তিহজার সহ যিকরে লিসানি তথা মৌখিক যিকির ও কলবি যিকিরের সমন্বিত যিকির। তাহলে এ যিকিরের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী:

ক. অন্তরে আল্লাহ তাআলার আযমত ও বড়ত্বের অনভূতি।

খ. ইস্তিহজার তথা আল্লাহ তাআলাকে হাজির নাযির মনে করে, তিনি আমাকে দেখছেন আমি তার সামনে আছি- এমন অনুভূতি নিয়ে যিকির করা।

গ. যিকিরের মা'না-মাফহুম তথা অর্থ ও মর্ম বুঝে যিকির করা।

ঘ. যিকির মাসনুন যিকির হওয়া বা শরীয়তসম্মত অন্য কোন যিকির হওয়া।

এ গেল যিকিরের কথা। আর যেসব আমলের তুলনায় এ যিকিরকে উত্তম বলা হয়েছে সেগুলোর অবস্থা হল- সেগুলোতে যথাযথ আল্লাহর ইয়াদ নেই, ইস্তিহযার এবং আযমত ও বড়ত্বের উপলব্ধি নেই। শুধু ভাসা ভাসা আমল। এমন ধরণের আমলের তুলনায় পূর্বোল্লিখিত যিকিরকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি জিহাদ করছে কিন্তু জিহাদরত অবস্থায় তার মুখে আল্লাহর যিকির নেই, অন্তরে আল্লাহর ইয়াদ ও আযমতের উপলব্ধি নেই- তার এ জিহাদের তুলনায় পূর্বোক্ত কামেল যিকিরের সওয়াব বেশি। যদিও তার জিহাদে কষ্ট হচ্ছে বেশি, কিন্তু যথাযথ লিসানি ও কলবি যিকিরের সমন্বয় না থাকার কারণে তার জিহাদের সওয়াব কমে গেছে। আর কমবেই বা না কেন, জিহাদরত অবস্থায় তো অন্তরে আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে ইয়াদ করার এবং যবান আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল রাখার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনির সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (আনফাল: ৪৫)

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

وقوله تعالى :{واذكروا الله كثيرا} يحتمل وجهين: أحدهما: ذكر الله تعالى باللسان، والآخر: الذكر بالقلب، وذلك على وجهين: أحدهما: ذكر ثواب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار؛ والثاني: ذكر دلائله ونعمه على عباده وما يستحقه عليهم من القيام بفرضه في جهاد أعدائه. وضروب هذه الأذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى بها النصر من الله

والجرأة على العدو والاستهانة بهم. وجائز أن يكون المراد بالآية جميع الأذكار لشمول الاسم لجميعها. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক’ এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

এক. মুখে আল্লাহ তাআলার যিকির করা।

দুই. অন্তরের যিকির।

অন্তরের যিকির আবার দুই ধরণের:

এক. আল্লাহর দুশমন মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে সুদৃঢ় ও অটল-অবিচল থাকার সওয়াব এবং যুদ্ধ হতে পলায়নের শাস্তির কথা স্বরণ করা।
দুই. আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী, বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজি এবং তার দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে ফরয দায়িত্ব তাদের উপর তার পাওনা রয়েছে- সেগুলো স্বরণ করা।

এই সব ধরণের যিকির অটল অবিচল থাকতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলার নুসরত লাভ এবং শত্রুর উপর দুঃসাহসিকতা দেখানো ও তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মাধ্যম হবে।

অধিকন্তু আয়াতের দ্বারা সব ধরণের যিকিরই উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যিকির শব্দ সব ধরণের যিকিরকেই বুঝায়।” (আহকামুল কুরআন: ৩/৮৬) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে, যথাযথ কলবি ও লিসানি যিকির সহ, আল্লাহ তাআলার আযমত ও ইস্তিহজার সহ, সওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে জিহাদ করবে- তার এ জিহাদের প্রতিদান উপরোক্ত কামেল যিকিরের চেয়েও বেশি। কেননা, এখানে দু’টি আমলের সমন্বয় ঘটেছে:

ক. কামেল যিকির।

খ. জিহাদ।

অতএব, এমন মুজাহিদের জিহাদের সওয়াব ঐসব ব্যক্তির কামেল যিকিরের চেয়ে বেশি, যারা বাড়িতে বা মসজিদে বসে, পূর্ণ ধ্যান খেয়ালে, পূর্ণ আযমত ও ইস্তিহজারের সাথে, অর্থ ও মর্ম বুঝে বুঝে মাসনুন ও শরীয়তসম্মত যিকিরে লিপ্ত আছে। কেননা, এসকল ব্যক্তির আমল হল একটা। তা হচ্ছে- শুধু যিকির। পক্ষান্তরে মুজাহিদের আমল দু'টি: ক. যিকির। খ. জিহাদ। কাজেই তার সওয়াব বেশি।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أشرت إليه مستشكلا في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد انه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك مما يدل على افضليته على غيره من الأعمال الصالحة، وطريق الجمع والله اعلم ان المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وان الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وان أفضلية الجهاد انما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له انه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى. اهـ

"কিতাবুল জিহাদের শুরুতে এ হাদিসের দিকে ঈঙ্গিত করে এসেছি। মুজাহিদের যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তার দাবি হল- জিহাদ অন্য সকল নেক কাজের চেয়ে উত্তম। যেমন- মুজাহিদ ঐ রোযাদারের মতো যে কখনোও রোযা ভাঙে না। ঐ ইবাদাত গুজারের মতো যে, কখনও বিরতি দেয় না। এছাড়াও অন্যান্য ফজিলত। এতদসত্ত্বেও এ হাদিসে যিকিরকে উত্তম বলাটা (বাহ্যত) মুশকিল মনে হয়। - ওয়াল্লাহু আ'লাম- উভয়ের সমন্বয় এভাবে হবে যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা কামেল যিকির উদ্দেশ্য। আর কামেল যিকির হল ঐ যিকির, যে যিকিরে মৌখিক যিকির এবং অর্থ ও মর্মে ফিকির করে করে আল্লাহ তাআলার আযমতের খেয়াল রেখে অন্তরের যিকির- উভয়টার সমন্বয় ঘটবে। যার মাঝে এমন যিকির পাওয়া যাবে সে ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম-

উদাহরণত- যে ব্যক্তি এই অবস্থা ব্যতিরেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর (ইস্তিহজার বিহীন) জিহাদ উত্তম হল (ইস্তিহজার বিহীন) মৌখিক যিকিরের চেয়ে। অতএব, যে ব্যক্তি এ উভয়টির সমন্বয় ঘটাবে; যেমন- উদাহরণত- ঐ ব্যক্তি, যে তার নামাযে, তার রোযায়, তার সাদাকায় বা কাফেরের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের হালতে ইস্তিহজারের সাথে তার যবানে ও অন্তরে আল্লাহ তাআলার যিকির করবে- তাহলে সে-ই (ফজিলতের) চূড়ান্ত দরজায় উপনীত হতে সক্ষম হবে।" (ফাতহুল বারি: ১১/২১০)

সারকথা দাঁড়াল-

♣ ইস্তিহজারের সাথে কামেল যিকিরের সওয়াব, ইস্তিহজার বিহীন জিহাদ ও অন্যান্য আমলের চেয়ে বেশি।

♣ ইস্তিহজার বিহীন জিহাদের সওয়াব, ইস্তিহজার বিহীন যিকিরের চেয়ে বেশি।

♣ ইস্তিহজার বিশিষ্ট জিহাদ ও অন্যান্য আমলের সওয়াব, ইস্তিহজার বিশিষ্ট কামেল যিকিরের চেয়ে বেশি।

এ থেকে এই ফলাফল দাঁড়াচ্ছে যে, যেসকল মুজাহিদ পূর্ণ ইখলাস ও যিকিরের সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত আছেন তাদের জিহাদ, ঐসব শিরিক ও বিদআতমুক্ত মুখলিস অলী, দরবেশ ও পীর মাশায়েখদের যিকিরের চেয়ে উত্তম, যারা ইস্তিহজার ও আযমতের সাথে, অর্থ ও মর্ম খেয়াল করে করে যিকিরে লিপ্ত আছেন। কেননা, তারা যে ধরণের যিকিরে লিপ্ত আছেন, মুজাহিদগণও এমনই- কিংবা তার চেয়ে উত্তম- যিকিরে লিপ্ত আছেন। অতিরিক্ত এই যে, মুজাহিদগণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদের জান-মাল ও সর্বস্ব ব্যয় করছেন আর তারা তা করছেন না। অতএব, যিকিরের দিক থেকে মুজাহিদগণ এবং মুখলিস ও শরীয়তের অনুগামী অলী দরবেশগণ সমানে সামান। আর মুজাহিদগণের শ্রেষ্টত্ব যে, তারা যিকিরের পাশাপাশি জিহাদেও লিপ্ত আছেন। অতএব, উক্ত হাদিস থেকে অলী দরবেশগণের উপর মুজাহিদগেণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

বি.দ্র.

ভুলে গেলে চলবে না যে, জিহাদ বর্তমানে ফরযে আইন। যিকির করা ফরয নয়, মুস্তাহাব। যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ ছেড়ে যিকিরে লিপ্ত আছেন, তারা- যদি

সব ধরণের শিরিক বিদআত থেকে মুক্ত থাকেন- তাহলে অন্তত এতটুকু বলতে হবে যে, ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত আছেন। আর যেসব মুজাহিদ ইস্তিহজার ও কামেল যিকির ছাড়া শুধু জিহাদে লিপ্ত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে, তারা নফল যিকিরের ফজিলত না পেলেও অন্তত কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। অতএব, এ হিসাবে জিহাদে লিপ্ত যেকোন মুজাহিদ- যদি তিনি অন্যান্য গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, জিহাদ তরককারী- যদিও অন্য সকল ফরয আদায়কারী হয়ে থাকেন- যেকোন যিকিরকারীর চেয়ে উত্তম। কেননা, যিকিরকারী ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত, আর মুজাহিদ নফলে লিপ্ত না থাকলেও কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। আর স্পষ্ট যে, আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুতেই ঐ ব্যক্তির মতো নয়, যে আল্লাহর সবগুলো ফরয আদায়ে লিপ্ত আছেন এবং কোন ধরণের নাফরমানীতে লিপ্ত নন।

যাহোক, সর্বদিক থেকে সকল মুজাহিদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর হিসাব নিকাশ আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে। আমার উদ্দেশ্য এতটুকু দেখানো যে, উপরোক্ত হাদিস জিহাদ ছেড়ে ঘরে বা খানকায় বসে থাকার বৈধতা দেয় না, মুজাহিদদের উপর খানকাহবাসীদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করে না।

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৪০৬

যিকির ও জিহাদ বিষয়ে মুরাবিত ভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট

fair of jihad

Junior Member

০৮-২১-২০১৮

ভুলে গেলে চলবে না যে, জিহাদ বর্তমানে ফরযে আইন। যিকির করা ফরয নয়, মুস্তাহাব। যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ ছেড়ে যিকিরে লিপ্ত আছেন, তারা- যদি সব ধরণের শিরিক বিদআত থেকে মুক্ত থাকেন- তাহলে অন্তত এতটুকু বলতে হবে যে, ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত আছেন। আর যেসব মুজাহিদ ইস্তিহজার ও কামেল যিকির ছাড়া শুধু জিহাদে লিপ্ত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে, তারা নফল যিকিরের ফজিলত না পেলেও অন্তত কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। অতএব, এ হিসাবে জিহাদে লিপ্ত যেকোন মুজাহিদ- যদি তিনি অন্যান্য গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, জিহাদ তরককারী- যদিও অন্য সকল ফরয আদায়কারী হয়ে থাকেন- যেকোন যিকিরকারীর চেয়ে উত্তম। কেননা, যিকিরকারী ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত, আর মুজাহিদ নফলে লিপ্ত না থাকলেও কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। আর স্পষ্ট যে, আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুতেই ঐ ব্যক্তির মতো নয়, যে আল্লাহর সবগুলো ফরয আদায়ে লিপ্ত আছেন এবং কোন ধরণের নাফরমানীতে লিপ্ত নন।

মাশাআল্লাহ যেন

قطعت جهيزة قول كل خطيب

হয়েছে!
এখানে সহজ একটি বিষয় আমরা এভাবেও বুঝতে পারি , কারো সৌন্দর্যের প্রশংসায় বলা হলোঃ

তার পুরো শরীরের মধ্যে ঠোঁট দুটি সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক , সবচেয়ে মুগ্ধকর, চোখের চেয়ে বেশী উন্মাদনা সৃষ্টিকারী নাকের চেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী গালের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল...।

তাহলে কি এর অর্থ দাঁড়ায় সেগুলোর মুকাবিলায় এটি একা বেশী সুন্দর ? নাকি সেগুলোর সাথে থেকে সুন্দর ?

এমনিভাবে আ'মালের সাথে যদি যিকির থাকে তাহলে সেটি আল্লাহর নৈকট্যের যেমন উসিলা হবে যিকির শূন্য আমাল তেমন হবেনা।

যিকর শূন্য গাফলতের নামাযের চেয়ে ইহছানের নামাযের মূল্য বেশী।

ইহছানের অর্থ কী ...?

"আল্লাহ কে আমি দেখছি /আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই ধ্যান নিয়ে কাজ করা"। তাই নয় কি?

আপনি যদি ইহছান আদায় করতে গিয়ে আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন এই ধ্যান নিয়ে বসে থেকে নামাযের সময় পার করে দেন,

আর দলীল পেশ করেন যে,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

"নামাজ অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করে আর আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড়।"

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করো"

যেমন পাকিস্তানের যিক্রি গ্রুপ নামাজ বাদ দিয়ে ৫ ওয়াক্ত যিকির করে থাকে। আপনিই বলুন ! এই ইহছানি যিকির আর যিকির বিহীন নামাযের মধ্যে 'কোনটি উত্তমের' কোন প্রশ্ন হতে পাড়ে !?

একজন 'ধ্যান' করে কিন্তু নামাজ পড়েনা, অন্যজন 'ধ্যান' ছাড়া নামাজ পড়ে, কে উত্তম ?!

জিহাদ যখন ফরযে আইন , (অথবা বর্তমানের খবর না থাকার কারণে হয়তো কেহ কিফায়া বলবেন; এখন কাফি পরিমানে) সেটি আদায় হওয়া ছাড়া যদি মন-যবান দ্বারা যিকিরে ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন আর জিহাদ তরকের ফিসকের সাথে থাকা হয়, তাহলে সে কি যিকির বিহীন মুজাহিদ থেকে উত্তম হয়ে যাবে ?

যিকির যেমন যবানের দ্বারা হয় তেমন অন্তর দ্বারাও হয় আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়। এসব ধাপের মধ্যে কিছু আছে ফরজ যেমন কিরাত পড়া(যবানের যিকর)। নিয়্যত করা(অন্তরের যিকর)। রুকুসিজদা করা(অংগ প্রত্যাঙ্গের যিকর)। কোন এক প্রকারের ফরজ দিয়ে অন্য প্রকারের ফরজ আদায় করার চিন্তা করা যায়না। কোন ভাবেই এক প্রকারের ফরজ এর মুকাবিলায় অন্য প্রকারের নফল মুস্তাহাবকে দাঁড় করানো যাবে না।

এখন মাথা নুইয়ে রুকু করা আর কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করা এটি ও যিকর আবার সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়া এটিও যিকর ।

আবার অন্তরে সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লার অর্থ খেয়াল করে ধ্যান করা সেটিও যিকির।
তবে মাথা নুইয়ে পিঠদিয়ে রুকু করা এটি ফরজ আর তাসবীহ পড়া সুন্নত ...। কোনটি উত্তম বলুন?!

যখন নামাজের উদ্দ্যেশ্যই হলো যিকির!

বলুন ! নামাজের মধ্যে লম্বা কিয়াম উত্তম না লম্বা সিজদা উত্তম? মুজতাহিদগণের সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে কিন্তু কেউ কি একটি ছেড়ে অপরটি লম্বা করার কথা বলেছেন?

যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিচ্ছেনঃ "হে নামাজী ! তোমার খুশু তোমাকে আল্লাহর যে সান্নিধ্যে পৌছাঁবে শুধু রুকু সে সান্নিধ্যে পৌছাবে না, ..."

"হে মুজাহিদ! তোমার যিকির তোমার জন্য আল্লাহর যে নুছরত বয়ে আনবে তোমার আঘাতে সে কাজ হবেন..."

(আল্লাহু আলাম)

মোট কথা প্রত্যেক আমলের সাথেই যিকিরের সম্পর্ক আছে ,

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

এই আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"আল্লাহর দিকে পবিত্র বাণী (যিকর) আরোহণ করে, আর সেটি আমলে ছালেহ কে উন্নত করে।"

আয়াতের আরেকটি স্বীকৃত তাফসীর হলঃ

"আল্লাহর দিকে পবিত্র বাণী আরোহন করে এবং আমলে ছালেহ তাকে উপরে উঠায়।"
এখন আমল বাদ দিয়ে যিকর করলে এই যিকর কাকে উপরে উঠাবে?

আর যিকর ছাড়া আমল উন্নত হবে কিভাবে ?

প্রত্যেক আমলকারী কে বলা হচ্ছে আমলের অহমিকায় না থেকে সেটিকে আল্লাহর স্মরণে ন্যাস্ত করতে ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত যিকিরের সাথে থাকতেন। সাহাবায়ে কিরাম এই হাদিস শুনে জিহাদ ছেড়ে যিকরে বসে যাননি , যেমনটি পাকিস্তানের যিক্রি গ্রুপ শুরু করেছে।

তারা নামাজের বিকল্প যিক্রি গ্রুপ হয়েছে আর এখন কিছু লোক জিহাদের বিকল্প যিক্রি হওয়ার ততপড়তায় লিপ্ত !

গুমরাহি কিন্তু একই!!

আল্লাহ তায়ালা সঠিক বুঝ নছীব করেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৪৫৮

গোলাম-বাঁদি: আল্লাহ তাআলার অনেক বড় রহমত

Mimbarut Tawhid

Member

০৯-২৯-২০১৮

আজ হঠাৎ গোলাম-বাঁদির কথাটা মনে আসল। মনে হল: গোলাম-বাঁদির বিধান আল্লাহ তাআলার অনেক বড় রহমত ছিল। কাফেররা ষড়যন্ত্র করে এ রহমতটা বন্ধ করে দিয়েছে।

রহমত কিভাবে হল- এটা বুঝার আগে বাঁদির পর্দা সম্পর্কে বলি: ইসলামে বাঁদির পর্দার বিধান হুররাহ্ তথা স্বাধীন মহিলাদের তুলনায় লঘু। হুররাহ্ মহিলাদের সতর যেখানে সমগ্র শরীর, বাঁদির সতর সে তুলনায় অর্ধেক। বাঁদির সতর তার পেট, পিঠ আর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। বাকি শরীর সতর নয়। মাথা, চেহারা, গলা, বুক এবং হাটুর নিচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সতর নয়। খাহেশাতের আশঙ্কা না হলে এগুলো দেখাও যাবে, ছোঁয়াও যাবে। আর মালিকের সামনে তো কোন পর্দাই নেই। মালিকের কাছে বাঁদি তার বিবির মতোই।

দ্বিতীয়ত: গোলাম-বাঁদি স্ত্রী-সন্তানের মতো নয়। অর্থাৎ স্ত্রী সন্তানকে যেমন নিজ সম্পদ খরচ করে লালন-পালন করতে হয়, গোলাম-বাঁদি এমন নয়। গোলাম-বাঁদি বরং নিজেরাই কামাই করে মালিককে দেবে। মালিক সে উপার্জন নিজে এবং নিজ স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা ও অন্যদের জন্য খরচ করবে। গোলাম-বাঁদির ভরণ-পোষণও সেখান থেকে দেবে। এ হিসেবে গোলাম-বাঁদি ধরতে গেলে বিনা পুঁজিতে ব্যবসা।

এবার আসুন রহমতের কথা বলি। একটা উদাহরণ দেই-

আপনার ৭ সন্তান। ৪ জন বড়। তারা পড়াশুনা করে। বাকি ৩ জন ছোট ছোট। একটা একেবারে দুধের শিশু। আপনি আপনার মাদ্রাসা, ফ্যাক্টরী বা অন্য কোন ব্যবসায় ব্যস্ত। কিংবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেড়িয়েছেন। আপনার পিতা-মাতা অসুস্থ। তাদের খেদমতের দরকার। আপনি বাড়িতে থাকেন না। তাদের খেদমতের কি ব্যবস্থা হবে? আপনার বাজার-সদাই কে করবে? আপনার ছেলেরাও পড়াশুনায় দিন-রাত ব্যস্ত। কিংবা তারা আবাসিক প্রতিষ্ঠানে পড়ে। মাঝে মাঝে

বাড়িতে আসে। আর ছোটগুলো খেদমতের যোগ্য হয়নি এখনও। তাদেরই বরং উল্টো খেদমত করতে হয়। অধিকন্তু আপনার একশো কাটা জমি আছে। সেগুলো ধান, পাট, তরিতরকারি চাষ করেছেন। ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে। আপনার পিতা-মাতা অসুস্থ। আপনার বিবি বাড়ির বাহিরে আসতে পারছেন না। আপনার চাকরির ব্যস্ততা আছে। বাড়িতে সার্বক্ষণিক থাকার সুযোগ আপনার নাই। এখন আপনার জমি-জিরাত আর ফল-ফসলের কি হবে?

চিন্তা করে দেখুন, যদি আপনার কিছু গোলাম-বাঁদি থাকতো তাহলে কোন সমস্যাই হতো না। বাহিরের ভারি কাজগুলো শ্রমিক আর গোলাম মিলে করতে পারতো। ধান উড়ানো, সিদ্ধ করা, শুকানো এগুলো বাঁদিরা করতে পারতো। বাঁদিদের তো তেমন পর্দা নেই। কাজের স্বার্থে আল্লাহ তাআলা তাদের পর্দার বিধান লঘু করে দিয়েছেন। তারা এগুলো করতে পারতো। ভিন পুরুষরা দেখলেও কোন সমস্যা হতো না। গোলাম-বাঁদি মিলে মিশেও কাজ করতে পারতো। কারণ, তাদেরও পরস্পর পর্দা ঐ অতটুকুই।

কিন্তু এ কাজগুলোর জন্য এখন আপনাকে পেরেশান হতে হচ্ছে। কারণ, আপনার বিবি বাহিরে আসতে পারছেন না। আর বাহিরের মহিলাদের দিয়েও আপনি একজন দ্বীনদার পুরষ সেগুলো করাতে পারছেন না। কারণ, বাহিরের মহিলাদের সতর সারা শরীর। আপনার বিবির মতো তারাও বাহিরে আসতে পারবে না। আপনি কিংবা কোন ভিন পুরুষ তাদের দেখতে পারবে না। আর বাহিরের পুরুষদের দিয়ে করালেও ঝামেলা থেকেই যাচ্ছে। কারণ, তারা ঠিকমতো বাড়ির ভেতর যেতে পারছে না। আপনার মা, বিবি আর মেয়েরাও তাদের সামনে যেতে পারছে না। পুরুষ দিয়ে কাজ করালেও কিন্তু ঝামেলা বেশ হচ্ছে। আর শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারটাতো আছেই।

পক্ষান্তরে আপনার যদি কয়েকটা বাঁদি থাকতো! তাহলে বড়ই সুবিধা হতো। এরা আপনার সব কাজ করতে পারতো। এদের সাথে আপনাদেরও পর্দা নেই, বাহিরের লোকেরও পর্দা নেই। এরা কাজ করবে। বাহিরের লোক দেখলে দেখুক। সমস্যা নেই। গোলামেরা বাহিরের ভারি কাজগুলো করে ফেললে আর বাঁদিরা ভেতরের কাজগুলো করে ফেললে ঝামেলাই হতো না। পর্দারও খেলাফ হতো না, কাজেরও ব্যাঘাত ঘটতো না।

আপনার অসুস্থ পিতা-মাতার খেদমতের দরকার। আপনি ঠিকমতো বাড়িতে থাকেন না। আপনার বিবি সব খেদমত করতে পারেন না। কারণ, শরীয়তে নিষেধ আছে। এখন যদি আপনার বাঁদি থাকতো? তারা খেদমত করতে পারতো। আর যেসব খেদমত আপনার নিজের বাঁদিরা করতে পারবে না, সেগুলোর জন্য আপনার একটা বাঁদি আপনার পিতাকে দিয়ে দিলেই হতো। সে আপনার পিতার সব খেদমত করতে পারতো। অধিকন্তু দেয়ারও দরকার পড়তো না। আপনার পিতার তো দুয়েকটা বাঁদি থাকবেই। দেখতেই পাচ্ছেন- অনেক সহজ হয়ে যেত।

আবার ধরুন, আপনার বাড়িতে অনুষ্ঠান। অনেক অতিথি এসেছে। এদের আপ্যায়ন খেদমত। অনেক কথা। আপনার মা-মেয়েরা অতিথিদের সামনে যেতে পারছে না। আবার গোলাম দিয়েও সব কাজ হচ্ছে না। কারণ, গোলামদের সাথে হুররাহ্ মহিলাদের পর্দা আছে। তারা আপনার মা-মেয়েদের সামনেও যেতে পারবে না, আপনার মহিলা অতিথিদের সামনেও যেতে পারবে না। ঝামেলা তো। এখন যদি আপনার বাঁদি থাকতো? বড় সুবিধা হতো। এরা অন্দর মহলেও যেতে পারতো। অতিথিদের সামনেও যেতে পারতো। মহিলাদের সামনেও। পুরুষদের সামনেও। এরা আপ্যায়নের সব কাজ করতে পারতো। অনেক সুবিধার ব্যাপার ছিল। বাঁদি না থাকায় আপনার মেয়েদের দিয়ে করাচ্ছেন। তাদের অপমান হচ্ছে। পর্দা লঙ্ঘন হচ্ছে। হারাম হচ্ছে। অমুক বাড়ির মেয়েদের দিয়ে করাচ্ছেন। অমুক ফ্ল্যাটের মেয়েদের দিয়ে করাচ্ছেন। এটাও হারাম হচ্ছে। কমিউনিটি সেন্টারে করাচ্ছেন। এখানেও হারাম হচ্ছে। বাঁদি থাকলে তা হতো না। কমিউনিটি সেন্টারে করালেও হতো না। সেখানেও বাঁদিরা করতে পারতো। তাদের সাথে তো পর্দা নেই। বাড়িতেও নেই। সেন্টারেও নেই। অনেক সুবিধা ছিল।

আবার ধরুন, আপনি গরীব মানুষ। বিবাহ করতে মন চাচ্ছে। কিন্তু পারছেন না। মোহরের টাকা নেই। বসে বসে বউ খাওয়াতে হবে। পয়সা আসবে কোত্থেকে? বউকে তো আর গার্মেন্টে দিতে পারবেন না। অনেক কষ্টে তিরিশ হাজার টাকা জমিয়েছেন। এটা দিয়ে তো মোহরের টাকাই হবে না। কি করবেন এখন? যদি একটা বাঁদি কিনে নিতেন, অনেক সুবিধা হতো। আপনার বাঁদি কাজ করতো। আপনার চলার খরচ হতো। তাকে দিয়ে আপনার বিবির হাজতও পুরা হতো।

হাসপাতালে নার্স লাগে। যদি বাঁদি থাকতো! সুবিধা হতো। রোগীর সাথেও পর্দা নেই, ডাক্তারের সাথেও পর্দা নেই। এখন হুররাহ মহিলা দিয়ে করানো হচ্ছে। হারাম হচ্ছে।

আরেকটা সুবিধার কথা বলি। একজন পুরুষ কিন্তু চারের অধিক বিবাহ করতে পারে না একসাথে। আর বউ খাওয়াতে হয় ঘরে বসিয়ে বসিয়ে। মোহর দিতে হয়। খরচ অনেক। তাই চারটা করাও কঠিন। কিন্তু বাঁদি আপনি যত ইচ্ছে রাখতে পারবেন। খরচও কম। তারা কাজ করবে। উপার্জন করবে। আপনার আয়ও হবে, মনের চাহিদাও পূরণ হবে। আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন মহিলাদের প্রতি আকর্ষণ দিয়ে। এক মহিলা দিয়ে আপনার মন ভরবে না। আরেকটা চাইবে। সেটা দিয়েও ভরবে না। আরো চাইবে। কিন্তু চারের বেশি তো পারবেন না। কিন্তু মন তো চাচ্ছে। যদি বাঁদি থাকতো। সুবিধে হতো। যত ইচ্ছা রাখতে পারতেন। বাকেরাও পারতেন, সায়্যিবাও পারতেন। খরচও কম। অনেক সুবিধা ছিল।

এখন বাঁদি নেই। কিন্তু মনের চাহিদা তো আগের মতোই। দশটা চাচ্ছে। বিশটা চাচ্ছে। অবৈধ প্রেম হচ্ছে। গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে। হারাম হচ্ছে। বাঁদি থাকলে! যত ইচ্ছা রাখতে পারতেন। সাথে নিয়েও ঘুরতে পারতেন। বাড়িতেও রাখতে পারতেন। অফিসেও রাখতে পারতেন। রাস্তায়ও রাখতে পারতেন। ভিন পুরুষে দেখলে সমস্যা নেই। পর্দা নেই যে। বড় সুবিধে ছিল। চাহিদাও মিটতো। হারামও হতো না।

শুধু তাই, বাঁদি থাকলে খরচ কম হতো। কিন্তু প্রেম কি আর ফ্রিতে পাওয়া যায়? হাজারে-লাখো খরচ হচ্ছে। হারামও হচ্ছে। খরচও হচ্ছে।

চাহিদাও কিন্তু সহজে মেটছে না। বদনামের ভয় আছে। আর এক মেয়ে দশ ছেলের সাথে প্রেম করে। এতে হচ্ছে মারামারি। কাটাকাটি। বাঁদি থাকলে কিছুই হতো না। আপনার বাঁদি আপনার থাকতো। তারটা তার। মারামারিও হতো না। বদনামও হতো না। হারামও হতো না। চাহিদাও মিটতো। খরচও কমতো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বিধান কতই না সুন্দর!

আরেকটা অফারের কথা বলি। আসলেই কিন্তু অফার। আপনার এক ফ্রেন্ড। তার অনেকগুলো বাঁদি। একটা বাঁদি আপনার পছন্দ হয়েছে। এখন কি করবেন? আপনার ফ্রেন্ডকে বলুন। দোস্ত! তোমার ঐ যে রাশিয়ান বাঁদিটা! ঐ যে সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে গনিমত পেলে। আমার কিন্তু দোস্ত অনেক পছন্দ। বাঁদিটা দোস্ত আমাকে দিয়ে

দাও। না দিয়ে পারবে না। আপনার ক্লোজ ফ্রেন্ড। তাছাড়া তার তো আছেই আরো কত! একটা দিয়ে দিলেই কি! অধিকন্তু সামনের তিন মাস পরে আবার যুদ্ধ হবে না! তখন তো আবার পাওয়াই যাবে। আপনাকে কিন্তু দিয়েই দেবে। দিয়ে দিলেই কিন্তু হলো। বিবাহ লাগবে না। অনুষ্ঠান নেই। মোহরও নেই। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোও নেই। আপেল গিফটের মতোই সহজ। দিলেই আপনার হয়ে গেল। আপনার মালিকানায় চলে এলো। তবে কষ্ট করে এক হায়েয পার করে একটু ইসতিবরা করাতে হবে। ব্যস এতটুকুই।

সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বিধান কত সুন্দর। আল্লাহ তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি তো জানেন কিভাবে কি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মনের চাহিদা তিনি বুঝেন। এজন্যই তো এত সহজ বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়! এটা না'কি মানবতা বিরোধী! লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আর এখন যে হুররাহ মহিলাদের দিয়ে বাঁদির কাজ করানো হচ্ছে- এটা মানবতা বিরোধী হচ্ছে না? এটা অপমান হচ্ছে না? বাঁদির চেয়েও নিকৃষ্ট পন্থায় যে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে, ভোগ করা হচ্ছে- এগুলো মানবতা বিরোধী হচ্ছে না? এক ছেলে দশ মেয়ে নিয়ে ঘুরলে, এক মেয়ে দশ ছেলের সাথে ঘুরলে মানবতা বিরোধী হয় না?

এসবই কাফেরদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। মানবতাবিরোধীর স্লোগান তুলে তারা গোলাম-বাঁদি তুলে দিয়েছে। আমরাও বেশ সহজেই মেনে নিয়েছি। আমাদের চেয়ে বোকা আর হয়! কিন্তু চাহিদা কি আর থেমে আছে? ফিতরাত কি আর বদলে গেছে? তা তো আগের মতোই আছে। গোলাম তো নেই। কিন্তু গোলামের কাজ তো করানোই হচ্ছে। বাঁদি নেই। কিন্তু বাঁদির চাহিদা তো পূরণ করাই হচ্ছে। বেশকম শুধু এতটুকু- হালালটা হারাম দিয়ে হচ্ছে। সওয়াবটা গুনাহের পথে হচ্ছে। শান্তি অশান্তিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর রহমতের বদলে গজব নাযিল হচ্ছে। ফিতনা ফাসাদের সয়লাবে দুনিয়া নরকে পরিণত হয়েছে।

হে আল্লাহ আমাদের হেফাজত কর! আমাদের সহীহ বুঝ দান কর!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৯৯৭

কাফের-বেঈমান-যিনদিকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: মাওলানা আবুল বাশার সাহেব উম্মাহকে কিসের সবক দিচ্ছেন?

Mimbarut Tawhid

Member

১০-০৬-২০১৮

০১

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব। সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। একজন তাহকিকী আলেম হিসেবে সুপরিচিত। কিন্তু ইদানিং তিনি কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? উম্মাহকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? সন্দেহ হচ্ছে। ফরীদ মাসউদের নাস্তিকধর্মী মতবাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছেন না-তো? তিনি ফরীদ মাসউদের শাগরেদ বটে। তবে তাকে ফরীদ মাসউদের মতাদর্শী মনে করতাম না। কিন্তু 'মাসিক আলকাউসার- আগস্ট ২০১৮' সংখ্যায় (পৃষ্ঠা: ৯-১২) তার যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে তো ভিন্নরূপ মনে হচ্ছে। তিনি কি তাহলে ফরীদ মাসউদের মানস সন্তান? লেখা দেখে তো তেমনই সন্দেহ হচ্ছে। যাহোক, ইয়াকীন করে বলা কঠিন। হয়তো তিনি ভুলও বুঝে থাকতে পারেন। এ কারণে তাকে ফরীদ মাসউদের মতাদর্শী, তার মতবাদ প্রচারে ব্রতী, তার মানস সন্তান- এসব লকব দিতে চাচ্ছি না। তবে তিনি উম্মাহকে যে দাওয়াত দিচ্ছেন, যে সবক শিখাতে চাচ্ছেন- সেটার ব্যাপারে কিছু না বলা উম্মাহর সাথে গাদ্দারী হবে মনে হচ্ছে। এ কারণেই কলম ধরেছি। নতুবা নিছক তার ব্যক্তিত্বে আঘাত করা- আল্লাহর পানাহ্- কিছুতেই আমার উদ্দেশ্য নয়।

'মাসিক আলকাউসার- আগস্ট ২০১৮' সংখ্যায় (পৃষ্ঠা: ৯-১২) তার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম: 'আপন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে করণীয় তিন কাজ'। এ প্রবন্ধে উম্মাহকে তিনি যে সবক শিখাচ্ছেন, তা উম্মাহকে কোথায় নিয়ে যাবে- একজন সচেতন পাঠক লেখাটি পড়লেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- আলকাউসারে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। মারকাযুদ্ দাওয়াহকে তো আমরা শদ্ধা করি। ইলমী তাহকিকের নমুনা হিসেবে পেশ করি। তাদের পক্ষে

কিভাবে সম্ভব হল লেখাটি ছাপা? যে লেখায় কুরআনে কারীমের বরাত দিয়ে গোমরাহীর দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, আকীদায়ে ইসলামিয়্যার স্বতসিদ্ধ মূলনীতির সম্পূর্ণ খেলাফ সবক শেখানো হচ্ছে; অথচ তার পক্ষে কোন একটা তাফসীরের বরাত পেশ করা হচ্ছে না, কোন একজন ইমামের একটা বক্তব্যও পেশ করা যাচ্ছে না, সম্পূর্ণই মনগড়া যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ- এমন একটা লেখা কিভাবে তারা ছাপতে পারলেন? অনেক আশ্চর্যের কথা। অবাক না হয়ে উপায় নেই। এসবের উপর ভিত্তি করে যদি কেউ বলে বসে যে, মারকাযুদ দাওয়াহর আকীদা বিশ্বাসও আসলে এমনই- তাহলে তার মুখ চেপে ধরার সুযোগ থাকবে কতটুকু? যদিও আমরা তা বলছি না, তবে কেউ বললে বাধা দেয়া কঠিন হবে মনে হচ্ছে।

আবুল বাশার সাহেব সূরা আহাযাবের ৪৮ নং আয়াত থেকে উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার্থে তিনটি কাজের সবক দিয়েছেন। আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

‘(হে নবী) আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ আপনাকে দেয়া হয়, তা অগ্রাহ্য করুন এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখুন। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।’ – সূরা আহযাব: ৪৮

আলোচনায় যাওয়ার আগে বলে রাখি- আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, আয়াতটি মানসূখ হয়নি। আয়াতের বিধান এখনও বহাল আছে। তবে অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন, আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছো। আয়াতের বিধান এখন আর প্রযোজ্য নয়। তবে মানসূখ হওয়া না হওয়াতে আসলে বিধানে তেমন কোন ফরক পড়ে না। এ আয়াত থেকে মুফাসসিরিনে কেরামের কেউ কেউ কাফের মুনাফিকদের প্রদত্ত এক বিশেষ প্রকারের কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করে নেয়ার কথা বলেছেন। সর্বপ্রকার জুলুম নির্যাতন আর কটূক্তি উপহাস মেনে নিতে বলেননি। সে হিসেবে বলেছেন, আয়াত মানসূখ নয়। আর যারা ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছেন, তারা বলেন, আয়াত মানসূখ। এ হিসেবে বিধানগতভাবে মূলত উভয় মতের মাঝে তেমন কোন দ্বিমত নেই।

যাহোক, আয়াত প্রসঙ্গে কিছু ইনশাআল্লাহ বলবো। আবুল বাশার সাহেব যে সবক দিতে চাচ্ছেন, সেটা একটু পেশ করি। তিনি বলেন,

"এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তিনটি হুকুম দিয়েছেন। ক. কাফের ও মুনাফিকদের কথায় চলো না; খ. তাদের দেয়া কষ্ট-ক্লেশ উপক্ষা কর এবং গ. আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ।" – পৃষ্ঠা: ৯

এ বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। এর সাথে আমাদের কোন দ্বিমত নেই।

সামনে গিয়ে বলেন,

"হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খৃস্টান প্রভৃতি অমুসলিম জাতির কথামত চলতে কুরআন আমাদের নিষেধ করে দিয়েছে। সে নিষেধাজ্ঞা বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে।" – পৃষ্ঠা: ৯

আরো সামনে গিয়ে বলেন,

"কুরআনের হুকুম অনুযায়ী কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য পরিহার করে চলতে হবে। তারা যা করতে বলে তা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং যে পরামর্শ দেয় তা অবশ্যই অগ্রাহ্য করতে হবে।

গ্রাহ্য করতে হবে কেবলই আল্লাহ ও রাসূলের কথা। শুনতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ'র নির্দেশনা। আঁকড়ে ধরতে হবে শরীয়তের পথ।" – পৃষ্ঠা: ১১

এ বক্তব্যও সম্পূর্ণ সত্য। এর সাথেও আমাদের কোন দ্বিমত নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কাফের মুনাফিকদের কথামত চলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। তাদের থেকে কষ্ট-ক্লেশ আসবে। সেগুলো বরদাশত করতে হবে। এতেও আমাদের আপত্তি নেই। দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। এতেও কোন দ্বিমত নেই। আল্লাহর উপরই তো আমরা ভরসা করবো। তিনিই তো আমাদের মালিক। মুফাসসিরিনে কেরাম সকলেই এ কথা বলেছেন। আয়াত থেকেও তা স্পষ্ট। এতে দ্বিমত করার মতো কিছু নেই। কিন্তু তিনি নিজে থেকে যে সবক দিতে চাচ্ছেন- সেটাই আপত্তি জনক।

প্রবন্ধে আপত্তির অনেক কিছুই আছে। সবগুলো তুলতে গেলে আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে। মৌলিকভাবে দু'টি আপত্তি তুলে ধরছি।

প্রথম আপত্তি: কাফের-বেঈমান-যিনদিকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সবক।

দ্বিতীয় আপত্তি: কাফের মুনাফিকদের পক্ষ হতে মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর হামলা হলে প্রতিহত না করে চরম ধৈর্যের সাথে উপক্ষা করে যাওয়ার সবক।

আয়াতের وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ(কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না) অংশ থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সবকটি, আর وَدَعْ أَذَاهُمْ(তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ আপনাকে দেয়া হয়, তা অগ্রাহ্য করুন) অংশ থেকে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্টা প্রদর্শনের সবকটি তিনি উদ্ধার করেছেন।

***

মাওলানা সাহেবের সবেকের আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আয়াত সম্পর্কে একটু আলোচনা জেনে নিই। তাহলে ইনশাআল্লাহ সবক বুঝতে সহজ হবে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

‘(হে নবী) আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ আপনাকে দেয়া হয়, তা অগ্রাহ্য করুন এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখুন। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।’ – সূরা আহযাব: ৪৮

এ আয়াতে মৌলিকভাবে দু’টি বিষয় বুঝা দরকার-

ক. কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

খ. কাফের মুনাফিকদের কষ্ট-ক্লেশ অগ্রাহ্য করা দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

ইমাম বাগাবী ও ইমাম কুরতুবীসহ আরো অনেকে উল্লেখ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পরে উহুদ যুদ্ধের পর মক্কার কাফেরদের একটা দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানায়, তিনি যেন তাদের দেব দেবীদের কোন সমালোচনা না করেন।

বরং তিনি যেন এ স্বীকারোক্তি দেন যে, এসব মূর্তি কেয়ামতের দিন সেগুলোর পূজারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবে। তাদের দেব দেবীর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদারতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তারা তার সাথে আর কোন বিবাদে জড়াবে না। কিছু মুনাফিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে মক্কার কাফেরদের পক্ষে সুপারিশ করতে থাকে- তিনি যেন তাদের কথায় রাজি হয়ে যান। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করে দেন- সাবধান! আপনি কিছুতেই এসব কাফের মুনাফিকের কথায় কান দেবেন না। কোন ধরণের ছাড় দিয়ে কথা বলবেন না। দ্বীনের দাওয়াতের বেলায় কোন ধরণের আপোষ করবেন না। আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অটল অবিচল থাকুন। আপনার এ দৃঢ় অবস্থানের কারণে হয়তো কাফের মুনাফিকদের পক্ষ থেকে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হবে। আপনি এর কোন পরোয়া করবেন না। কোন ধরণের হীনমন্যতার শিকার হবেন না। দৃঢ়চিত্তে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আপনার মিশন চালিয়ে যান। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে হিফাজত করবেন। আর কখনোও কোন কষ্টের সম্মুখীন হলেও, সেটা বাহ্যত যদিও কষ্ট কিন্তু বাস্তবে তাতেও অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব, আপনি এসব কিছুর পরোয়া না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে দৃঢ়তার সাথে দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যান।

কেউ কেউ ভিন্ন ঘটনাও বলেছেন। তবে যাই হোক, আয়াত ব্যাপক। সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলার হুকুম: কাফের মুনাফিকদের আবদার-আবেদন, কু-পরামর্শ আর হুমকি ধমকির ভয়ে দ্বীন প্রচার-প্রসার থেকে বিরত থাকা যাবে না। দ্বীনের বেলায় কোন ধরণের শিথিলতা উদারতা দেখানো যাবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ চালিয়েই যেতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ধরণের শিথিলতা করা কিংবা দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজ বন্ধ করে দেওয়া কাফেরদের আনুগত্যেরই নামান্তর।

এ আয়াতের নির্দেশনার অনুরূপ সূরা আহযাবের শুরুর আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً

“হে নবী, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা ও মহাপ্রজ্ঞাময়।” – সূরা আহযাব: ১

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম বাগাবী রহ. বলেন,

أنزلت في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل و أبي الأعوروعمرو بن سفيان السلمي، وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين بعد قتال أحد، وقد أعطاهم النبي ﷺ الأمان على أن يكلموه، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق، فقالوا للنبي ﷺ وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة، وقل إن لها شفاعة لمن عبدها، وندعك وربك،

فشق ذلك على النبي ﷺ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم، فقال: إني قد أعطيتهم الأمان، فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يخرجهم من المدينة فأنزل الله تعالى: {يا أيها النبي اتق الله} أي دم على التقوى ... وقيل: الخطاب مع النبي ﷺ والمراد به الأمة. وقال الضحاك: معناه اتق الله ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم. ولا تطع الكافرين من أهل مكة يعني أبا سفيان وعكرمة و أبا الأعور، والمنفقين، من أهل المدينة عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد وطعمة. اهـ

“আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, আবুল আওয়ার ও আমর ইবনে সুফিয়ান আসসুলামির ব্যাপারে। ঘটনা হল- উহুদ যুদ্ধের পর তারা মদীনায় এসে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের বাড়িতে উঠে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর সাথে আলোচনার জন্য আমান-নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাদের সাথে (মুনাফিক) আব্দুল্লাহ ইবনে সা’দ ইবনে আবি সারহ্ এবং ত্বু’মা ইবনে উবাইরিক্বও আসল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রস্তাব দিল, আপনি আমাদের দেবতা লাত, উজ্জা ও মানাতের সমালোচনা ছেড়ে দিন এবং বলুন যে, যারা সেগুলোর পূজা করবে, সেগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবে। এমনটা হলে

আমরা আপনাকে আপনার রবের ইবাদত করতে মুক্ত ছেড়ে দেব। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন।

তাদের এ প্রস্তাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পেলেন। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, এদের হত্যা করে ফেলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, আমি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি (কাজেই হত্যার অনুমতি দিতে পারি না)। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বললেন, বেরিয়ে যাও তোমরা মদীনা থেকে, আল্লাহর লা'নত আর গজব নিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দেন, তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিতে। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন, 'হে নবী, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন'। অর্থাৎ পূর্বের মতোই আল্লাহ তাআলার তাকওয়ার উপর অটল থাকুন। ... আর মক্কার কাফের আবু সুফিয়ান, ইকরিমা ও আবুল আওয়ার এবং মদীনার মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ও তু'মাদের আনুগত্য করবেন না।" – তাফসীরে বাগাবী: ৩/৬০৬

সূরা আযহাবের এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য না করার যে অর্থ বিধৃত হয়েছে, এ অর্থই আমাদের বক্ষমান আয়াত তথা সূরার ৪৮ নং আয়াতে প্রযোজ্য। এ কারণেই বক্ষমান ৪৮ নং আয়াতে এসে **ইমাম বাগাবী রহ. বলেন,**

ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكرنا تفسيره في أول السورة. اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী, 'আপনি কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না'- সূরার শুরুতে এর তাফসীর পেশ করে এসেছি।" – তাফসীরে বাগাবী: ৩/৬৪৮

৪৮ নং আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

(ولا تطع الكافرين والمنافقين) أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم." الكافرين": أبي سفيان وعكرمة و أبي الأعور السلمي، قالوا: يا محمد، لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. و" المنافقين": عبد الله بن أبي وعبد الله ابن سعد وطعمة بن أبيرق، حثوا النبي ﷺ على إجابتهم بتعلة المصلحة. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘আপনি কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না’। অর্থাৎ দ্বীনি বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শনের যে পরামর্শ তারা আপনাকে দিচ্ছে, আপনি তাতে তাদের কথামত চলবেন না এবং তাতে সায় দেবেন না। কাফেররা ছিল- আবু সুফিয়ান, ইকরিমা ও আবুল আওয়ার আসসুলামি। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাদের মা’বূদদের মন্দ বলবেন না। তাহলে আমরা আপনাকে মেনে চলবো। আর মুনাফিকরা হল- আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, আব্দুল্লাহ ইবনে সা’দ ও ত্বু’মা ইবনে উবাইরিক্ব। তারা মাসলাহাতের বাহানা তুলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের প্রস্তাব মেনে নিতে প্ররোচনা দিচ্ছিল।” – তাফসীরে কুরতুবী: ১৪/২০২

শাইখুল ইসলাম আবুস সাউদ হানাফী রহ. বলেন,

{وَلاَ تُطِعِ الكافرين والمنافقين} نهيٌ عن مداراتِهم في أمرِ الدَّعوةِ واستعمالِ لينِ الجانبِ في التبليغِ والمسامحةِ في الإنذارِ كُني عن ذلكَ بالنَّهيِ عن طاعتِهم مبالغة في الزجر والتنفيرِ عن المنهيّ عنه بنظمه في سلكِها وتصويرِه بصورتِها ... {وَدَعْ أذاهم} أي لاتبال بأذيَّتِهم لك بسببِ تصلبكَ في الدَّعوةِ والإنذارِ{وَتَوَكَّلْ عَلَى الله} في كلِّ ما تأتِي وما تذرُ من الشئون التي من جملتِها هذا الشَّأنُ فإنَّه تعالى يكفيكهُم {وكفى بالله وَكِيلاً} موكُولاً إليهِ الأمورُ في كلِّ الأحوالِ .اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘আপনি কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না’। আল্লাহ তাআলা নিষেধ করছেন, দ্বীনের বিষয়ে যেন তিনি তাদের সাথে কোন নমনীয়তা না দেখান। দাওয়াতের বেলায় যেন কোন নম্রতা প্রদর্শন না করেন। ভীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে যেন কোন উদারতা না দেখান। তাদের আনুগত্য করা থেকে নিষেধ করার দ্বারা তিনি এ দিকেই ঈঙ্গিত করেছেন। (সরাসরি না বলে এভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে বলেছেন) নিষেধটিকে আরো মজবুত করার জন্য। নিষিদ্ধ বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরানোর জন্য। এ জন্য একে (অর্থাৎ নমনীয়তা দেখানো, নম্রতা প্রদর্শন ও উদারতা দেখানোকে) তিনি কাফের মুনাফিকদের আনুগত্যের কাতারে দাঁড় করিয়েছেন। একে তাদের আনুগত্যরূপে পেশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘এবং তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ আপনাকে দেয়া হয়, তা অগ্রাহ্য করুন’। অর্থাৎ দাওয়াত ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আপনার সুদৃঢ়

অবস্থানের কারণে তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ আপনার উপর আসবে, আপনি তার কোন পরোয়া করবেন না। আর আপনি যা করেন বা না করেন- যার মধ্যে কাফের মুনাফিকদের কথা না মানার বিষয়টিও আছে- সকল কিছুতে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে আপনার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। .. " – তাফসীরে আবুস সাউদ: ৭/১০৮

প্রিয় পাঠক, আশাকরি আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য- কিছুতেই কাফের মুশরেকদের সাথে আপোষ করা যাবে না। তাদের মুখের উপর তাদের ধর্ম ও তন্ত্র-মন্ত্রকে অসাড়, ভিত্তিহীন ও মনগড়া বলে দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে নেয়ার এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানাতে হবে। আর স্পষ্ট যে, তাদের পূজনীয় ব্যক্তি, সংস্থা, মূর্তি ও সংবিধানের বদনাম করলে, তাদের মতবাদ ও বিধি বিধানকে অসাড় আখ্যায়িত করলে- নিশ্চয় তারা তা মেনে নেবে না। মুসলমানদের উপর, দ্বীনের দাঈদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন আর কষ্ট-ক্লেশের বাণ নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার আদেশ- যত কিছুই হোক, দ্বীনের প্রচার-প্রসার থেকে বিরত হবে না। তাদের কথায় কোন কান দেবে না। তাদের হুমকি ধমকির কোন পরোয়া করবে না। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কথা মান্য কর। কাফের, মুশরেক, যিনদিক, বেঈমান ও মুনাফিকদের সাথে কোন ধরণের আপোষ করা থেকে একদম বিরত থাক। মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আপোষেরই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। মাসলাহাতের বাহানা তুলে মুনাফেকের দল এ প্রস্তাব মেনে নেয়ারই প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের এ প্রস্তাব মানতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, হে নবী, তাদের প্রস্তাবে আপনি যদি কোন আপোষ করেন, তাহলে জেনে রাখুন, এমনটা করলে আপনি আমি আল্লাহকে ছেড়ে কাফের বেঈমানদের আনুগত্য করেছেন বলে ধরা হবে। অতএব, সাবধান! আল্লাহর রাসূলও তাদের এ ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। মাসলাহাতপন্থী মুনাফিকদের কথারও কোন মূল্য দেননি। উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন, দ্বীনের ব্যাপারে এমনই অবিচলতার পরিচয় দিতে হয়।

প্রিয় পাঠক, আজ যেখানে সারা বিশ্বে কুফরীর ঝড় উঠেছে। মুসলিম নামধারী মুনাফিক শাসকরা আল্লাহর শরীয়ত প্রত্যাখান করে তাদের পশ্চিমা রবদের গণতন্ত্র

ধর্ম গ্রহণ করেছে, সারা মুসলিম উম্মাহকে এ কুফরির দিকে আহবান করছে, প্রত্যাখান করলে নেমে আসছে নির্মর অত্যাচারের ধারালো খড়্গ- প্রিয় পাঠক, এমন সময় নবীর শিক্ষা: তাদের এ তন্ত্র-মন্ত্র প্রত্যাখান কর। *মুখের উপর বলে দাও- মানিনা তোমাদের এ নব্য জাহিলিয়্যাতের লাত-উজ্জাকে। মানিনা তোমাদের সংবিধান নামক মানাতকে। আমরা আল্লাহর গোলাম। আমরা চাই আল্লাহর শরীয়ত। যতদিন শরীয়ত প্রতিষ্ঠা না হবে, সকল কাফের বেঈমান আল্লাহর শরীয়তের বশ্যতা যতদিন স্বীকার না করবে, ততদিন তোমাদের সাথে আমাদের কোন আপোষ নেই।

প্রিয় পাঠক, এটাই আল্লাহর আদেশ। এটাই নবীর শিক্ষা। কিন্তু আপসোস! আবুল বাশার সাহেব এ আয়াত থেকেই দিতে চাচ্ছেন বেঈমানদের সাথে সহাবস্থানের শিক্ষা। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সবক।

লক্ষ করুন মাওলানা সাহেবের বক্তব্য-

"প্রথম হুকুম হচ্ছে- কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। কাফের মানে অবিশ্বাসী, অমুসলিম, যারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় বা তাঁকে এক মানে না, যারা প্রতিমার পূজা করে, যারা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা জাহানের সকল মানুষের নবী মানে না বরং তাঁকে সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার করে না, যারা কুরআন মাজীদকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করে না বা কুরআনে প্রদত্ত বিধানাবলীকে আপন আপন ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় বলে স্বীকার করে না, যারা কুরআনের আইন পরিবর্তনযোগ্য বলে ধারণা রাখে- এরা সকলেই কাফের ও অমুসলিম। কুরআন-বর্ণিত যে-কোনও একটা বিষয়কেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, সেও কাফের। নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, কাদিয়ানী প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন বলছে- এদের আনুগত্য করো না এবং এদের কথা ও পরামর্শ অনুযায়ী চলো না।

কুরআন এদের সাথে সহাবস্থান করতে নিষেধ করেনি। এর জন্য ভারসাম্যপূর্ণ নীতিও দান করেছে। কুরআনের সেই শিক্ষা ও বিধান অনুসারে যে-কোনও অমুসলিম জাতির সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা যাবে। তাদের প্রতিও মানবিক আচরণ করা শরীয়তের হুকুম। তাদের প্রতি জুলুম করা বা শুধুশুধুই তাদের উত্ত্যক্ত করা কুরআনী আইনে সম্পূর্ণ নিষেধ ও নাজায়েয। শরীয়তের শুধু তাদের আনুগত্য

করতে, একান্ত পরামর্শক ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে।" – পৃষ্ঠা: ৯

দেখুন, আল্লাহ তাআলা কি বুঝিয়েছেন আর মাওলানা সাহেব কিসের সবক দিচ্ছেন! কোথায় আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আর আপোষহীনতার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিচ্ছেন, আর কোথায় মাওলানা সাহেব তাদের সাথে মিলে মিশে শান্তি সৌহার্দ্যের সখ্যতা গড়ার দাওয়াত দিচ্ছেন! নেই কোন বরাত, নেই কোন রেফারেন্স। একান্তই মনগড়া অপব্যাখ্যা। আর এটাই না'কি ফিকহ। এটাই না'কি দ্বীনের প্রকৃত সমঝ। আর আমরা জিহাদিরা না'কি ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী। আমাদের না'কি কোন বুঝ নেই, সমঝ নেই। কোন ফিকহ নেই। দুঃখ কার কাছে বলবো। ফাইলাল্লাহিল মুশতাকা!

অধিকন্তু মক্কার মুশরেকরা তো সহাবস্থানের দাওয়াত নিয়েও আসেনি। শুধু আপোষের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। মদীনার মুনাফিকরাও কোন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুপারিশ করেনি। শুধু একটু আপোষ করে নেয়ার সুপারিশ করেছিল। তাদের পূজ্যদের মন্দচারি না বলার সুপারিশ করেছিল। প্রিয় পাঠক, এতটুকুই ছিল মুনাফিকদের দরখাস্ত। তাহলে আজ যারা শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়, বরং একেবারে সহাবস্থানের; শুধু তাই নয়, একেবারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সবক শিখাচ্ছেন- তারা কোন শ্রেণীতে পড়বেন; সেটা পাঠকের বিবেচনাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।

আপাতত এ অংশের আলোচনা এখানেই রাখছি। সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো, কাফেরদের সাথে সহাবস্থানের ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে? এবার আয়াতের দ্বিতীয় অংশে যাই।

(চলমান)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১০৮৯

জামাত ও তানজীম গঠন কি বিদআত?

মিম্বারুত তাওহিদ, প্রশ্ন নং ৪৭০১ (সম্পূর্ণ)

Mimbarut Tawhid

Member

১০-১৮-২০১৮

প্রশ্ন:

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ! আল্লাহ তাআলা আমাদের শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামকে হিফাযত করুন। সমকালীন মাশায়েখদের কারো কারো থেকে – যেমন শায়খ আলবানী (আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করুন)- শুনছি যে, তারা ফতোয়া দিচ্ছেন, তানজীম এবং আন্দোলনী জামাত গঠন বিদআত। আমাদের ধর্মে তা জায়েয নয়।

কয়েকটি জালেম শাসনব্যবস্থার পতনের পর আমরা কিছুটা স্বাধীনতা পাচ্ছি- যেমনটা আপনারাও জানেন। তাই চাচ্ছি একটা তানজীম তলে একতাবদ্ধ হতে, যা এই জাহিলী সমাজে আমাদের সুরক্ষার উপকরণ হবে। আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা ফতোয়া দিন, এটি জায়েয হবে কি হবে না। আল্লাহ তাআলা আপনাদের মাঝে বারাকাহ দান করুন।

নিবেদক

আবু ফারুক

উত্তর:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

সকলেরই জানা যে, আল্লাহ তাআলার শরীয়তের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল ব্যতীত যে কোন মাসআলাতেই হোক- হালাল বা হারামের দাবি করা জায়েয নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116.

"তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তোমাদের যবানা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না।"- নাহল: ১১৬

দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহায়তামূলক জামাত ও তানজীম গঠন করা যারা হারাম বলেন, তাদের হাতে নির্ভরযোগ্য কোন শরয়ী দলীল নেই। আর যাদের দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ না থাকবে, তাদের দাবি মিথ্যা।

বাস্তবতা হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং তানজীম গঠন করা প্রত্যাখানের দাওয়াত মূলত তবিয়ত ও সহজাত প্রকৃতি বিরোধী কাজ। সকল জ্ঞানীর নিকটই স্বীকৃত যে, ঐক্যবদ্ধতা ও ভ্রাতৃত্ব-নুসরতের মাধ্যমে যা করা সম্ভব, বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।

একক ব্যক্তি দুর্বল। কিন্তু তার সহযোগীদের নিয়ে শক্তিশালী। তার এমন কারো প্রয়োজন, যারা তাকে সহায়তা করবে ও শক্তি যোগাবে। বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় বিষয়াদির বেলায়। যেমনটা মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ] {القصص: 34 - 35.

"আমার ভাই হারুন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার বাহু

শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।"- কাসাস: ৩৪-৩৪

ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া যেমন গত্যন্তর নেই, এমন একজন আমীরেরও কোন বিকল্প নেই, যিনি তাদেরকে পরিচালিত করবেন এবং তার কথা শুনা হবে ও আনুগত্য করা হবে।

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم .. ولا سراة إذا جهالهم سادوا

والبيت لا يبتنى إلا باعمدة .. ولا عماد إذا لم ترس أوتاد

فإن تجمع أوتاد وأعمدة .. وساكن بلغوا الأمر الذي رادوا

'আমীর বিহীন অরাজকতার মাঝে শান্তি-শৃংখলা সম্ভব নয় ...আর জাহেলরা যদি আমীর হয়ে বসে থাকে, তাহলে এই নেতৃত্বেরও কোন মূল্য নেই।

খুঁটি বিহীন ঘর দাঁড়াতে পারে না ..... আর পেরেক না গাড়লে খুঁটিও কাজ দেবে না।

গৃহকর্মী, পেরেক ও খুঁটি একত্র হলেই তখন .... যে বাসনা তারা স্থির করেছে, তাতে কামিয়াব হতে পারবে।'

এটা যে শুধু মনুষ্য সমাজে তা-ই নয়, জন্তু-জানোয়ারের মাঝেও এমনটা দেখা যায়। সকল জন্তুকে আমরা দেখি, তারা দল বেঁধে চলাফেরা করে; একা একা না। প্রত্যেক দলের মাঝে দেখি একটা করে সর্দার থাকে, যেটি এদেরকে সামনে নিয়ে চলে।

(এ গেল যুক্তিভিত্তিক কথা।) আর জামাত ও তানজীম গঠনের পক্ষে (শরয়ী) দলীল যদি দিতে যাই, তাহলে দলীলের তো অভাব নেই। এখানে কয়েকটা উল্লেখ করছি-

এক.
আল্লাহ তাআলার বাণী,

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]

‘তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।’- মায়েদা: ২

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং নেক ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহায়তা করতে আদেশ দিয়েছেন। আর নেক ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহায়তা করাই দাওয়াতি ও জিহাদি জামাত ও তানজীমসমূহের উদ্দেশ্য। অতএব, এসব জামাত ও তানজীম আয়াতের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ।

দুই.

আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

‘আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’- আলে ইমরান: ১০৩

আল্লাহ তাআলা আদেশ দিচ্ছেন, ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে। আর এসব জামাত ও তানজীম মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার জন্য নয়, যেমনটা কেউ কেউ মনে করে; বরং যতদিন একক জামাত গঠন করার সুযোগ না আসবে, ততদিন এগুলো মুসলমানদেরকে এসবের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ মাত্র। পূর্ণ ও একক ঐক্যের অপেক্ষার বাহানায় মুসলমানদেরকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন ছেড়ে রাখা কল্যাণকর কিছু নয়। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা অপেক্ষা আংশিক ঐক্যও শ্রেয়। যা পরিপূর্ণ অর্জন করা যায় না, তা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়াও যায় না।

সকল ভূখণ্ড ও অঞ্চলের দাঈদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থন জরুরী। এই সমন্বিত আমলটিই তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জামাত গঠন করতে তাগাদা দিচ্ছে। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মোপোকরণ- সবগুলোই এমন বিষয়, যেগুলো মুসলিম জামাতসমূহের পরস্পরের মাঝে স্বতন্ত্রবৈশিষ্টসম্পন্ন ভিন্নতা সৃষ্টির দাবিদার। যেমনটা জাতি, গোষ্ঠী ও জনপদের ভিন্নতার কারণে স্বাভাবিক হয়ে থাকে। এটা সকল মুসলিম এক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার পরিপন্থী না।

বরং ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন আমল ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যসম্বলিত দলসমূহের পরস্পরে নিজেদের মাঝেকার ঐক্য অনেক সময় মুসলমানদের সার্বজনীন একক ঐক্য গঠনে সহায়ক হয়।

তিন.

আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: 104-

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি ‘উম্মাহ’ তথা দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।’- আলে ইমরান: ১০৪

আমাদের বিবাদমান বিষয়টিতে এ আয়াত সুস্পষ্ট সমাধান। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে ‘উম্মাহ’ তথা দলবদ্ধভাবে কল্যাণের দিকে আহ্বানের আদেশ দিয়েছেন। ‘উম্মাহ’ বলা হয় জামাতকে। যেমন আল্লাহর তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

‘তিনি (মূসা আলাইহিস সালাম) কূপের কাছে এক উম্মাহ তথা একদল লোককে পেলেন, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত।’- কাসাস: ২৩

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

‘আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি উম্মাহ তথা একদল লোক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা গভীর রাতে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সেজদা করে।’- আলে ইমরান: ১১৩

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

‘তাদের একটি উম্মাহ তথা কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী। আর তাদের অনেকে মন্দ কাজ করে যাচ্ছে।’- মায়েদা: ৬৬

জামাত ও তানজীম গঠন (আয়াতে বর্ণিত) এই ‘উম্মাহ’ তথা জামাত সৃষ্টির বাস্তবিক প্রয়োগ বৈ কিছু নয়।

চার.

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم

‘তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।’- আবু দাউদ।

ইমাম আহমাদ রহ. তার নিজ মুসনাদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

‘যে কোন তিন ব্যক্তির জন্য কোন মরু ময়দানে অবস্থান করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।’

এ দুই হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সফরের হালতে এক আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক- যদিও মুসাফিরের সংখ্যা তিন জনই হোক না কেন।

বক্তব্যের ভাষ্য ঈঙ্গিত করছে যে, এর চেয়ে বড় যে কোন বিষয়ে অবশ্যই এক আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যেমনটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ দুই হাদিসের টীকায় বলেন,

‘সবচে’ কম সংখ্যাবিশিষ্ট জামাত ও সবচে’ ছোট্ট ইজতিমার বেলায়ও যখন একজনকে আমীর বানানো আবশ্যক করেছেন, তখন তা এর চেয়ে বড় জামাত ও ইজতিমার বেলায় আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ হচ্ছে।’- মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৬৫

তিনি আরো বলেন,

‘সফরের হালতে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট একটি জামাআতের বেলায়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, সব ধরণের জামাআতের ক্ষেত্রেই আমীর বানিয়ে নেয়া আবশ্যক।’- মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০

শাওকানি রহ. বলেন,

‘মরুময়দানে কিংবা সফরে থাকা তিন জনের বেলায়ই যখন এই বিধান; তখন গ্রাম ও শহরে বসবাসরত এর চেয়ে বেশি সংখ্যক, যারা পারস্পরিক জুলুম প্রতিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর প্রতি মুখাপেক্ষী, তাদের বেলায় তো এ বিধান এর আগেই প্রযোজ্য হবে।’- নাইলুল আওতার: ৯/১২৮

এই আদেশের হেকমত কি- সেদিকে ইশারা করে শাওকানি রহ. বলেন,

‘এটি দলীল যে, তিন বা ততোধিক সংখ্যার সকলের জন্য এই বিধান- তারা তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেবে। কেননা, এর মাধ্যমেই তারা পারস্পরিক মতবিরোধ থেকে মুক্তি পাবে, যে মতবিরোধ তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করবে। আমীর নির্ধারণ না করলে সকলেই নিজের বুঝ অনুযায়ী স্বেচ্ছাচারিতা দেখাবে। নিজ খাহেশাত মতো কাজ করবে। এভাবে তারা ধ্বংসে নিপতিত হবে। পক্ষান্তরে আমীর বানিয়ে নিলে মতবিরোধ কমে যাবে এবং একতা সৃষ্টি হবে।’- নাইলুল আওতার: ৯/১২৮

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ ব্যাপারে বলেন,

‘কেননা, পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মানব জাতির মাসলাহাতসমূহের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। কারণ, তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর ঐক্যবদ্ধ হতে গেলে তাদের একজন নেতা আবশ্যক।’- মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০

পাঁচ.

ইমাম আহমাদ রহ. নিজ মুসনাদে আবু সালেহের বরাতে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,

لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة على الحق ولا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله

‘এই দ্বীনের সংরক্ষণে সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল থাকবে। বিরোদ্ধবাদিদের বিরোধীতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার ফায়সালা আসার পূর্ব পর্যন্তই তারা অটল থাকবে।’

ইবনে মাজাহ্ রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন,

لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها تقاتل أعداء الله كلما ذهبت حرب نشبت حرب قوم آخرين حتى تأتيهم الساعة

‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই আল্লাহ তাআলার আদেশর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিরোদ্ধবাদিরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। যখনই এক যুদ্ধ শেষ হবে, তখনই আরেক কওমের সাথে যুদ্ধের সূচনা হবে। কেয়ামত আসা অবধিই এভাবে চলবে।’ হাদিসটির সনদ হাসান।

এসকল হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, তায়েফায়ে মানসূরা, যারা কেয়ামত অবধি এ দ্বীনের হেফাজত করবে, তারা সংঘবদ্ধ দল হবে। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তি হবে না। তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত "الطائفة" ও "العصابة" বিশেষণ দু’টি থেকে এমনটিই বুঝা যায়।

ছয়.

হাওয়াযেন সম্প্রদায়ের বন্দীদের ঘটনায় ইমাম বুখারী রহ. হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ. থেকে বর্ণনা করেন; মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا

'আমরা জানতে পারছি না যে, তোমাদের কে (বন্দীদের ফিরিয়ে দিতে) অনুমতি দিচ্ছে আর কে দিচ্ছে না। তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের (সম্মতি-অসম্মতির) বিষয়টা তোমাদের সর্দারগণ আমাদের নিকট পেশ করা পর্যন্ত আমি কোন ফায়াসালা দিচ্ছি না। এতে লোকজন ফিরে যায়। অতঃপর তাদের সর্দারগণ তাদের সাথে কথা বলে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সংবাদ দেয় যে, তারা সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিয়েছে।'

عرفاء হচ্ছে عريف এর বহুবচন। عريف বলে- যে ব্যক্তি نقيب এর মতো কওমের অবস্থাদি ও অন্যান্য বিষয়ের খবরাখবর রাখে। এ হাদিস এভাবে দলীল হচ্ছে যে, হাদিসে পাওয়া গেল, লোকজন বিভিন্ন জামাতে বিভক্ত ছিল, যাদের প্রত্যেক জামাতের একজন করে عريف ছিল। এটি দলীল যে, এমন দল গঠন বৈধ, যে দলের একজন প্রধান থাকবেন, যিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন। যেমন, কোন গোষ্ঠীর শায়খ, কোন জনপদের বড় ব্যক্তিটি এবং কওমের অগ্রগণ্য লোকটি নেতৃত্ব দেন। এবং এ রকম আরো অন্যান্য। মুসলমানদের মাঝে সর্বদাই এমনটি চলে আসছে। কেউ তাতে আপত্তি করেনি। কেউ তাতে প্রশ্ন তুলেনি। এর মাঝে এবং নিজেদেরই একজনকে আমীর নির্ধারণ করে দাওয়াত ও দ্বীনের প্রচারের জন্য কোন জামাত গঠনের মাঝে কোন তফাৎ নেই।

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন,

'عريف ও নিরীক্ষক নিযুক্ত করা ইমামের জন্য সুন্নত। কেননা, ইমামের জন্য সবকিছু সরাসরি নিজে দেখাশুনা করা সম্ভব নয়। কাজেই এমন কিছু লোক তার দরকার, যাদেরকে তিনি তার সহায়তার জন্য এবং এসব বিষয়ের কতক অংশ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নির্বাচন করে নেবেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করেছেন। যেন তারা পরস্পর পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন, সকল লোক

যেন একশ্রেণীভুক্ত না হয়। কেননা, এমনটা হলে সুলতানের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে।'- ইবনে বাত্তাল রহ. কৃত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ: ৮/২৪৯

সাত.

শরয়ী দলীল প্রমাণ দিয়ে প্রমাণিত যে, ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকা শরীয়তের অন্যতম মাকসাদ। একতাবদ্ধতা, জামাতের সংখ্যাবৃদ্ধি ও জামাতে সাথে জড়িত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদায়ক এবং একাকী, বিচ্ছিন্ন ও পৃথক থাকা থেকে সতর্কীকরণমূলক অসংখ্য নস ও বিধি বিধান এটি বুঝাচ্ছে। এসব নসের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি:

১.

عن ابن عباس - ﷺ -: أن رسول الله ﷺ قال»: خير الصحابة: أربعة وخير السرايا: أربعمائة، وخير الجيوش: أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة». أخرجه الترمذي، وأبو داود.

'হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম সাথী হল চার জন। ছোট বাহিনির মধ্যে সর্বোত্তম হল, চার শত জনের বাহিনি। বড় বাহিনির মধ্যে সর্বোত্তম হল, চার হাজারের বাহিনি। আর বার হাজারের বাহিনি কিছুতেই সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।'- তিরমিযি, আবু দাউদ।

২.

عن أبي الدرداء - ﷺ - قال: سمعت رسول الله -ﷺ -يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية».أخرجه أبو داود والنسائي.

'হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যদি তিন জন লোক থাকে আর তাদের মাঝে নামায কায়েম না করা হয়, তাহলে

শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যায়। *কাজেই, তুমি জামাতের সঙ্গে থাক। কেননা, দলবিচ্ছিন্ন বকরিকেই বাঘে খেয়ে থাকে।'- আবু দাউদ, নাসায়ী।

৩.

عن عبد الله بن عمر - ﷺ - قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» أخرجه البخاري والترمذي.

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একাকী থাকার মাঝে যে ক্ষতির কথা আমি জানি লোকজন যদি তা জানতো, তাহলে কোন আরোহী রাত্রি বেলায় একাকি আরোহণ করতো না।'- বুখারী, তিরমিযি।

৪.

عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن رسول الله -ﷺ- قال» :الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة ما يهم، يهم». أخرجه الموطأ.

'সায়িদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শয়তান এক জন ও দুই জনের প্রতি লোভ করে। তিন জন হয়ে গেলে আর করে না।'- মুআত্তা।

৫.

عن عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب» أخرجه الموطأ و أبو داود والترمذي.

'আমর ইবনে শুয়াইব রহ. তার পিতৃসূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একাকী আরোহী ব্যক্তি শয়তান। দুই জান আরোহীও শয়তান। তিন জন হল পূর্ণ আরোহী জামাত।'- *মুআত্তা, আবু দাউদ, তিরমিযি।

৬.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يجمع الله أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة» هكذا - ورفع يديه - «فإنه من شذ شذ في النار» رواه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" وابن أبي عاصم في السنة .وقال علي بن أبي طالب - ﷺ - كدر الجماعة خير من صفو الفرد.

'হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে কোন গোমরাহির ব্যাপারে একমত করবেন না। জামাতের উপর আল্লাহ তাআলার হাত আছে। - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উভয় হাত উঁচু করে দেখান- এভাবে। কাজেই যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হবে, সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

হাদিসটি খতীব বাগদাদি 'আলফকিহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' কিতাবে এবং ইবনে আবি আসেম 'আসসুন্নাহ্' কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জামাতের ঘোলাটাও একক ব্যক্তির স্বচ্ছটা অপেক্ষা উত্তম।'

আট.

যেসব দলীল উল্লেখ করেছি, সেগুলো যে শুধু জামাত ও তানজীমের বৈধতাই বুঝাচ্ছে তাই নয়; বরং বিষয়টি ফরয পর্যায়ে গড়াবে। কেননা, আজকের দুনিয়ায় দ্বীনি খেদমতের কোন কাজই সংঘবদ্ধভাবে হওয়া ব্যতীত ফলপ্রসূ হবে না। আর মূলনীতি হল,

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

'যে জিনিস ব্যতীত ফরয যথাযথ আদায় সম্ভব নয়, সেটাও ফরয।'

যেমনটা মারাক্বিস সুউদ- এ বলা হয়েছে,

وما وجوب واجب قد أطلقا ... به وجوبه به تحققا

এই মূলনীতির স্বপক্ষে একটি দলীল হল, হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস। তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের বৎসর রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাররুজ জাহরান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন আমাদের মাঝে ঘোষণা

দিলেন, শত্রুর মুখোমুখী হতে হবে। ফলে তিনি আমাদেরকে রোযা ভেঙে ফেলতে আদেশ দেন। আমরা সবাই রোযা ভেঙে ফেলি।' ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহীহ।

লক্ষণীয়, রোযাদার মুসাফিরের জন্য রোযা ভেঙে ফেলা এমনিতেই জায়েয। কিন্তু যেহেতু রোযা ভাঙা ছাড়া জিহাদ যথাযথ সম্ভব নয়, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ভেঙে ফেলার আদেশ দিয়েছেন। যাতে মুজাহিদগণ জিহাদে এবং শত্রুর মোকাবেলায় শক্তি পায়। ফলে রোযা ভাঙা ফরয হয়ে গেছে। কেননা, 'যে জিনিস ব্যতীত ফরয যথাযথ আদায় সম্ভব নয়, সেটাও ফরয।'

এমনই আরেকটি দলীল- আল্লাহ তাআলার এ বাণী,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60

'আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে।'- আনফাল: ৬০

ই'দাদ ব্যতীত যখন জিহাদ সম্ভব নয়, তখন ই'দাদও ফরয হয়ে গেল।

***

তানজীম ও জামাতের বিরোধীরা জায়েয বাইয়াতকে কেবল মুসলমানদের সার্বজনীন একক খলিফার বাইয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন। তাদের দাবি, এছাড়া অন্য সকল বাইয়াতের অর্থ দলাদলী ও বিচ্ছিন্নতার দিকে আহ্বান। আর এটা নব আবিষ্কৃত বিদআত।

বাইয়াতকে বিদআত দাবি করার ব্যাপারে আপত্তি আছে। কেনন, বিদআতের সংজ্ঞা হল, 'বিদআত বলা হয় এমন বিষয়কে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় যেটি করার কারণ ও আবশ্যকতা দেখা দেওয়া সত্তেও এবং সেটি করার সুযোগ থাকা সত্তেও তিনি তা করেননি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এসব তানজীম ও জামাতের আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। কাজেই, সে যামানায় এগুলো ছিল না বাহানা তুলে এগুলোকে বিদআত বলে দেয়া

উচিৎ নয়। এসব তানজীমের অনুরূপ যেসব বিষয়ের আবশ্যকতা তখন দেখা দিয়েছে, সেগুলো সে যামানায়ও পাওয়া গেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তা আমল করেছেনও। যেমন, عرفاءনির্বাচন।

আর তাদের দাবি, 'খলিফা ছাড়া অন্য কারো বাইয়াত জায়েয নয়'- ইমাম ত্বহাবি রহ. একে প্রত্যাখান ও খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন,

"যায়েদ ইবনে ওয়াহব থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'কোন তিন ব্যক্তি সফরে থাকলে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। এ-ই হল সে আমীর, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীর বানিয়ে গেছেন।'

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার গোলাম নাফে রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান এবং তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

'তিন ব্যক্তি সফরে থাকলে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।

নাফে রহ. বলেন, তখন আমি আবু সালামাকে বললাম, তাহলে আপনি আমাদের আমীর।

আবু জা'ফর (তথা ত্বহাবি রহ.) বলেন, লোকজন তাদের আমীরদের থেকে দূরে অবস্থান কালে নিজেদের জন্য যে আমীর বানিয়ে নেবে, উক্ত দুই হাদিস বুঝাচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ আমীরকে মুকিম থাকাবস্থার আমীরদের সমস্তরের সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতো সে আমীরের আদশকেও অবশ্যশ্রবণীয় ও পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন।"- বায়ানু মুশকিলিল আছার: ১১/২০৫

সায়্যিদ ইমাম তার মূল্যবান কিতাব **'আলউমদাহ্ ফি ই'দাদিল উদ্দাহ্'** কিতাবে তাদের এ সংশয়ের অপনোদন করেছেন। সেখানে তিনি সালাফের অনেকগুলো বাইয়াত দেখিয়েছেন, যেগুলো তারা তাদের যামানার খলিফা ছাড়া অন্যদের হাতে দিয়েছেন। কিতাবটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

***

তবে মনে রাখতে হবে, আমরা যখন জামাত ও তানজীম গঠনের বৈধতার কথা বলছি- তখন এর অর্থ এই নয় যে, বিদ্যমান প্রত্যেকটি জামাতে যোগ দেয়া বৈধ বলছি। বরং এটি নির্ধারণ হবে প্রত্যেক জামাতের মানহাজের ধরণের ভিত্তিতে। প্রত্যেক এমন জামাত, যার কুরআন সন্নাহ সমর্থিত মানহাজ রয়েছে এবং সেটি বিচ্যুতি ও বিদআত থেকে মুক্ত- তাতে যোগ দেয়া বৈধ। আর প্রত্যেক এমন জামাত, যা বিদআতি মানহাজের উপর চলে, কিংবা বিকৃত ফিকির লালন করে, তাতে যোগ দেয়া জায়েয নয়।

والله اعلم والحمد لله رب العالمين.

উত্তর প্রদানে:

শায়খ আবুল মুনযির আশশানকিতি

সদস্য, শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহিদ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১২৩৮

অন্ধ অনুসরণ হতে সাবধান! - শায়খ আবু মুহাম্মাদ আইমান

তানভির হাসান

Senior Member

১০-০৪-২০১৮

>==========♠অন্ধ অনুসরণ হতে সাবধান!♠==========<

=======[শায়খ আবু মুহাম্মাদ আইমান]=======

কোনো দলীল ছাড়া কিংবা শরয়ী দলীলের বিরোধিতায় নিজ পিতৃপুরুষ বা পূর্বসূরীদেরকে অন্ধ অনুসরণ করা চরম ভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়। আর এটাই হলো কাফেরদের গোমরাহী ও কুফুরীর অন্যতম কারণ; তা আজকের হোক কিংবা পূর্বকালের হোক।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

“তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করবো। যদি শয়তান তাদেরকে জলন্ত আগুনের (জাহান্নামের) শাস্তির দিকে ডাকে তবুও কি তারা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করবে?” -সূরা লুকমান: ২১

এরূপ তাকলীদের মানে হলো- বড়দের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান দেখানো; আর এমন ধারণা পোষণ করা যে, তাদের দ্বারা কোনো ভুলই হতে পারে না। আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুসলিমদের কিছু নেতৃত্বশীল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে; যারা তাগুতকে সন্তুষ্ট রাখার লক্ষ্যে দ্বীনকে এবং এর মৌলিক বিষয়াদিকে বিকৃত করে।

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক হচ্ছে- তারা মানুষের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবে।

এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে উত্তম লোকদের। যেমনি আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

"তোমাদের অভিভাবক তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাগণ।" -সূরা মায়েদা: ৫৫

তেমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এ কথা জানা আবশ্যক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর এ উম্মতের কেউই মা'সুম নন। আর যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় তার পূর্ব অবস্থাতে ফিরে যেতে পারে, মুরতাদ হয়ে যেতে পারে।

একদল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবত পেয়েছিলেন; কিন্তু তারা তাঁর ওফাতের পর মুরতাদ হয়ে যায়। এটা ছিল তাকদীরের লিখন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

فو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتي مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فى دخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتي مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

"আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতী ব্যক্তির মতো আমল করতে থাকবে। এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে ব্যবধান থাকবে কেবল একহাত পরিমাণ। তারপর তাকদীর তার ওপর বিজয় হয়ে যায়, ফলে সে জাহান্নামীদের মতো আমল করতে শুরু করে।

এমনকি সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে থাকবে। এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের

মাঝে কেবল এক হাত ফারাক থাকে। তারপর তার ওপর তাকদীর বিজয় হয়ে যায়। আর সে জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে। এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করে।"

-বুখারী ও মুসলিম।

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاتعجبوا بعمل أحد حتي تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لومات دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل زمانا من دهره لومات دخل النار ثم يتحوُّل فيعمل عملاصالحا، فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعم لصالح

"তোমরা কারো আমল দেখে আশ্চর্য হয়ো না, যতক্ষণ না দেখো- তাদের শেষ পরিণতি কী হলো? কেননা কোনো কোনো আমলকারী এমন আছে, সে জীবনের দীর্ঘ সময় ভালো আমল করতে থাকে।

এমনকি যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত থাকে; কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়।

তারপর সে খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এমন কিছু লোক আছে, যারা জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে খারাপ আমল করতে থাকে।

এমনকি তার অবস্থা এমন হয় যে, সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারপর তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়, সে ভালো আমল করতে থাকে।

যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার ভালো চান, তবে তাকে মৃত্যুর আগে সুযোগ দেন। তাকে ভালো আমল করার তাওফীক দান করেন।"

(ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, আলবানী রহ. বলেন এ হাদীসের সনদ সহীহ, আস-সুন্নাহ লি ইবনে আসেম:১/১৭৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন–

إنما الأعمال بالخو اتيم

"সকল আমলের ফলাফল নির্ভর করে শেষ পরিণতির ওপর।" -বুখারী: ৬৬০৭

কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা থেকে মুক্ত নয়। সে কিছুদিন পর গোমরাহীর দিকে ফিরে যেতে পারে।

ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন-

لايقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر

"তোমাদের কেউ যেন দ্বীনের ক্ষেত্রে কারো অন্ধ অনুসরণ না করে; যদি সে ঈমান আনে তাহলে এ ব্যক্তিও ঈমান আনে। আবার সে যদি কাফের হয়ে যায়; তাহলে এ ব্যক্তিও কাফের হয়ে যায়। কেননা মন্দের ভেতরে কোনো রূপ আদর্শ নেই।- ইলামুল মুআকিয়ীন: ২/১৭৬

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন এমন আলেমের সম্পর্কে, যে তার পূর্বের অবস্থার দিকে ফিরে যায়। ঈমান আনার পর আবার কুফরী করে। যেন আমরা অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামি থেকে সাবধান থাকি।

আল্লাহর দেয়া উদাহরণ–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ– وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

"আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সে লোকের কথা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে সে সকল নিদর্শনসমূহের বদৌলতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম।

কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইলো। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো; যদি তাকে তাড়া করো তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে।" -সূরা আ'রাফ: ১৭৫-১৭৬

হে আমার ভাই! আপনি দ্বীন শিক্ষা করুন। সত্যকে জানুন, সত্য দিয়ে সত্যবাদীকে চিনতে পারবেন।

জানতে পারবেন- কার থেকে দূরে থাকতে হবে; যেন আপনি তাকে প্রতিহত করতে পারেন।

من رأي منكرا فليغيره "যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ প্রত্যক্ষ করে, সে যেন তা পরিবর্তন করে"

আপনি কারো চাটুকার হবেন না। নেতা যেদিকে যাবে, আপনি তার পেছনে চলে যাবেন এমন যেন না হয়। যখন আপনার নেতা বিকৃত পথে হাঁটা শুরু করবে, তাকে নাসীহা করবেন। প্রত্যাখ্যান করবেন তার কথাকে।

আপনার চিন্তার দ্বার বন্ধ করে রাখবেন না। সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সব সময় মাথায় রাখবেন। যে জাতিই চিন্তার দ্বার বন্ধ করে রেখেছে, তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

"তারা আরও বলবে- যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম! তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।" -সূরা মুলক: ১০

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১০৫৮

গণতন্ত্রের পক্ষে ইসলামি(!!) গণতন্ত্রিদের কিছু কঠিন যুক্তির সহজ জবাব

Adil khan

Junior Member

১১-১১-২০১৮

এক যুগেরও বেশী আগের কথা।

গণতন্ত্র নামক মানবরচিত মতবাদের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের ব্যর্থ চেষ্টারত দল ও মতের নেতাকর্মীদেরকে গণতন্ত্র পরিহার করে জিহাদের পথে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানালে তাদের যেসব কঠিন(!) যুক্তির সম্মুখীন হতাম এবং সেসব কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর দিতাম,তার কিছু উল্লেখ করা সময়োপযোগী মনে করছি।

কারণ, এই দীর্ঘসময় পর অফলাইনে না হলেও অনলাইনে মাঝে মাঝে অনুরুপ প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে।

আসুন ১৩/১৪ বছর আগে ফিরে যাই.....

জিহাদ সমর্থকঃ

গণতন্ত্র পরিহার করুন।কারণ গণতন্ত্র একটি মানবরচিত কুফুরী মতবাদ। আর মানবরচিত কুফুরী মতবাদের মাধ্যমে কখনো আল্লাহর দ্বীন কায়েম হতে পারে না।

ইসলামী গণতন্ত্রীঃ

দেখুন, কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যেধরণের অস্ত্র ব্যবহার করে,মুসলিমদেরকেও অনুরুপ পাল্টা অস্ত্র ব্যবহার করা উচিৎ। রাসূল সাঃ এর সময় কাফিররা তরবারি ব্যবহার করেছিলো,তাই মুসলিমরাও তরবারির মাধ্যমে জবাব দিয়েছিলো। এখন তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে এসেছে,তাই তাদেরকে গণতান্ত্রিকভাবেই মোকাবেলা করতে হবে।

জিহাদ সমর্থকঃ

কাফিররা সেসময় মূর্তির পূজা করতো,আল্লাহর রাসূল সাঃ ও সাহাবীরা কী মূর্তির মাধ্যমে মোকাবেলা করেছিলেন ? আজকের গণতন্ত্র আর সেকালের মূর্তির দু'টিই

কুফুরী ও শিরক। গণতন্ত্রের মোকাবেলায় যদি গণতন্ত্র হয়,তাহলে মূর্তির মোকাবেলা মূর্তির মাধ্যমে করা উচিৎ ছিলো !!!

আর সেকালের কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তরবারি ব্যবহার করেছিলো। আজকের কাফিররা কী খালি হাতে??আজকে তারা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র,ট্যাংক,কামান,যুদ্ধ বিমান,ক্ষেপনাস্ত্র,পারমানবিক অস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

আপনার যুক্তি অনুযায়ী মুসলিমদেরও কী এগুলোর মাধ্যমেই মোকাবেলা করা উচিৎ নয় ??

(১৩/১৪ বছর আগেও সঠিক জবাব পাইনি, আজও দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্।

ইসলামী গণতন্ত্রীঃ

(গণতন্ত্রকে বৈধতা দিতে না পেরে জিহাদ সমর্থককে উদ্দেশ্য করে।) এই রাষ্ট্র যেহেতু গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত । আর আপনারা জিহাদীরাও এখানেই বসবাস করেন,সুতরাং আপনারাওতো গণতন্ত্রকে মেনেই চলেন ।

জিহাদ সমর্থকঃ

গণতন্ত্র হচ্ছে একটি কুফুরী মতবাদ,যা নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের হাতে আইন তৈরির ক্ষমতা দেয়। পক্ষান্তরে আমরা এই কুফুররী মতবাদকে সর্বাত্মকভাবে বর্জন করেছি এবং একে চরমভাবে ঘৃণা করি।

এরপরও আমরা কীভাবে গণতন্ত্রকে মেনে চললাম,বুঝলাম না !

আচ্ছা, আল্লাহর রাসূল সাঃ মক্কার শিরকী পরিবেশে ছিলেন বলে কী বলা যাবে, উনিওতো মূর্তিপূজা মেনেই মক্কায় ছিলেন ??? (না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক)

কিংবা মুসা আঃ ফির'আউনের রাজ্যে এবং ইব্রাহীম আঃ নমরুদের রাজ্যে ছিলেন বলে কী বলা যাবে,উনারা ফির'আউন ও নমরুদের কুফুরী ও মূর্তিপূজার রাজত্ব মেনেই ছিলেন ???

আচ্ছা, বাতিল আইনে পরিচালিত রাষ্ট্রে থাকি বলে যদি এটিকে মেনে নেয়া বুঝায়,তাহলে কী আমরা বুঝবো, আপনারা এই কুফুরী রাষ্ট্রের সকল কুফুরী আইন মেনে নিয়েছেন ?

তার মানে কী আপনারা মদের লাইসেন্স দেয়া,পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স,সুদের বৈধতা দান এগুলোকে মেনে নিয়েছেন ???

(জবাব পাইনি.....)

ইসলামী গণতন্ত্রীঃ

(একপর্যায়ে গণতন্ত্র বিরোধীদেরর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে.....) এদেশে যেহেতু গণতন্ত্র চলে,তাই কেউ যদি তা মানতে না চায় এবং মানে না বলে দাবী করে,তাহলে তার উচিৎ এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া !

কারণ তাদের গণতান্ত্রিক দেশে থাকা মানায় না।

জিহাদ সমর্থকঃ

আল্লাহর যমিনে যারা আল্লাহর দ্বীন মানতে চায়না এবং মানে না,তাদের এবং তাদের সমর্থকদের আল্লাহর এই যমিন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিৎ !!

কারণ, আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন না মানা ব্যক্তিদের মানায় না !!!

(লা-জাওয়াব.....)
উপরের এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি স্বয়ং আমি হয়েছিলাম এবং অনুরুপ উত্তরই দিয়েছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ্।

১৩/১৪ বছর পর আজও অনলাইনে দেখছি, গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের ব্যর্থ ও ইসলাম বহির্ভূত প্রচেষ্টাকে বৈধ করার জন্য সেই আদিযুগের ছেলেমানুষি যুক্তি দিতে!

যেমনঃ আমরা বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করাই, জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করি,ট্যাক্স দেই ইত্যাদির মাধ্যমে বুঝাতে চায়,আমরা নাকি গণতন্ত্রের মধ্যেই আছি !

মানে গণতন্ত্র মেনে চলি !!!

এসব হাস্যকর যুক্তির জন্য আশা করি বিগত ১৩/১৪ বছর আগের উত্তরই যথেষ্ট হবে। নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করছি না।

গণতন্ত্রের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, গণতন্ত্র এই যুগের সবচেয়ে জঘন্য ও প্রতারণাপূর্ণ মানবরচিত কুফুরী+শিরকী মতবাদ এবং একটি স্বতন্ত্র দ্বীন।

কোনোভাবেই আমরা গণতন্ত্রকে মানি না এবং মানবো না ।

এমনকি যদি আমাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় এবং আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়া হয়।

রাসূল সাঃ শিরক্ মেনে না নেওয়ার জন্য একথাই বলেছেন।

গণতন্ত্র হচ্ছে সকল কুফুরী ও আল্লাহদ্রোহীতার রক্ষক।

এটি সকল কুফুরী ও শিরককে নিরাপত্তা দেয় এবং লালন-পালন করে।

গণতন্ত্রের আল্লাহদ্রোহীতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এটিকে অক্ষত রেখে কিংবা গণতান্ত্রিক পন্থায় আল্লাহর যমিন থেকে শিরক্,কুফর উৎখাত করা এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা স্ববিরোধিতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গণতন্ত্রের কী এবং এর হুকুম কী এব্যাপারে জানতে আল-কায়েদার শীর্ষস্থানীয় আলিম শাইখ আবু মুহাম্মাদ 'আসিম আল-মাক্বদিসী হাফিঃ লিখিত 'আদ-দিমুক্বরাতি
য়্যাহ দ্বীনুন' অর্থাৎ 'গণতন্ত্র একটি দ্বীন' কিতাবটির অনুবাদ ভালোভাবে পড়ূন।

কিতাবের নামঃ 'গণতন্ত্র একটি দ্বীন।

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৫৭

খেলাফত না থাকলে কি অন্য কোন তানজীম করা যাবে না? - একটি সংশয়ের নিরসন

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-০৬-২০১৮

এক ভাই একটা হাদিস উল্লেখ করে বর্তমান যামানার আলোকে হাদিসটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। ভাইয়ের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, এ হাদিসের আলোকে বর্তমান যামানায় - যেখানে খেলাফত নেই – অন্য কোন জিহাদি তানজীম গঠন করা বা তাতে যোগ দেয়া নাজায়েয প্রমাণিত হয়। হাদিসটি সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কিতাবে এসেছে। সহীহ বুখারীতে হাদিসটি এমন:

بَاب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ عَلَى ذَلِكَ .

“হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল!

আমরা তো জাহিলীয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রজাল থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, এর ধূম্রজাল কিরূপ? তিনি বললেনঃ এক জামা'আত আমার তরীকা ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কিছু স্বভাবের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কী করতে হুকুম দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি আরজ করলাম, যদি তখন মুসলিমদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে তুমি তখন ঐ সকল (গোমরাহ) দল-মত পরিত্যাগ করে আলদা হয়ে যাবে। এ কারণে যদি কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয়-তাহলেও। যতক্ষণ না সে (বিচ্ছিন্ন) অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।" –

সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৬৬৭৩

হাদিসে সংশয়ের অংশটুকু হল, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا (তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে আলদা হয়ে যাবে।)

সংশয়ে যারা পড়েছেন তারা বলতে চাচ্ছেন, এ অংশ থেকে বুঝা যায়, খেলাফত না থাকলে অন্য সকল দলমত পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে যেতে হবে। কোন দল বা তানজীমে যোগ দেয়া যাবে না। বর্তমানে যেহেতু খেলাফত নেই, তাই কোন জিহাদি তানজীম করা যাবে না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একাকী থাকতে হবে।

এ হলো সংশয়। যেহেতু এ পোস্ট যাদের নজরে পড়বে, তাদের কেউ কেউ হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যা না জানার কারণে সন্দেহের শিকার হয়ে পড়তে পারেন, তাই সন্দেহ নিরসনকল্পে হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরা আবশ্যক মনে করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ্।

হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যায় গেলে দুই দিক থেকে সন্দেহটা খণ্ডন হয়ে যায়:

এক.

হাদিসে হক-বাতিল সকল দল ও তানজীম পরিত্যাগ করতে বলা হয়নি, বরং গোমরাহ দল পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। এসব গোমরাহ দলের পরিচয় হাদিসে একটু আগেই এভাবে দেয়া হয়েছে,

دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا

'জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।'

হাদিসের পরের অংশে এদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, **فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا** (তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে আলদা হয়ে যাবে।)

হাদিসের উদ্দেশ্য, খেলাফতে রাশেদা পার হওয়ার পর ফেতনা দেখা দেবে। তখন যদিও খেলাফত থাকবে, কিন্তু খেলাফতের রাশেদার মতো হবে না। তারা বিভিন্ন *জুলুম অত্যাচার ও গোমরাহির শিকার হবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি হবে। তোমরা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না। ইমামুল মুসলিমীন ও তার জামাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যদিও তারা জালেম ও অত্যাচারি হয়, তথাপি তাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করে ঐসব বিচ্ছিন্ন ও গোমরাহ এবং জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী দলসমূহের কোনটাতে গিয়ে মিলিত হবে না। আর যদি খেলাফত না থাকে, তাহলে বিচ্ছিন্ন থাকবে। তবুও কোন গোমরাহ দলে মিলিত হবে না। কোন গোমরাহ দলে যোগ দেয়ার চেয়ে একাকী মৃত্যুবরণ করা ভাল।

মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها" أي الفرق الضالة الو اقعة على خلاف الجادة من طريق أهل السنة والجماعة. اهـ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তাহলে তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে যাবে'- অর্থাৎ ঐ সকল দল-মত,

যেগুলো আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআর সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।” – **মিরকাত: ১৫/৩৪২**

তাহলে হাদিসের অর্থ দাঁড়ালো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা মানহাজ থেকে বিচ্যুত সকল দলমত পরিত্যাগ করতে হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের সাথে মিলিত হতে হাদিসে নিষেধ করা হয়নি।

এ হাদিসের মর্ম পরিষ্কার হয় অন্য একটি হাদিস দ্বারা। ইমাম তিরিমিযি রহ. বর্ণনা করেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.

“আমার উম্মত তেয়াত্তর (৭৩) দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের এক দল ব্যতীত বাকি সব জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলটি কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তারা হল সেই দল, যারা আমি ও আমার সাহাবাদের ত্বরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত।” – **তিরমিযি: ১৭১**

হাদিসটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো মিলে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের তথা দলীল হওয়ার উপযুক্ত।

এ হাদিসে যে গোমরাহ বায়াত্তর (৭২) ফেরকার কথা বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারেই আমাদের আলোচ্য হাদিসে বলা হয়েছে, **فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا** (তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে আলদা হয়ে যাবে।) অবশিষ্ট একদল, যারা মুক্তিপ্রাপ্ত হবে, তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দল- তাদের সাথে মিলিত হতে নিষেধ করা হয়নি।

দুই.

দ্বিতীয়ত যদি এ হাদিস দ্বারা ব্যাপক অর্থ তথা সকল দলমত ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থও গ্রহণ করা হয়, তাহলেও সঠিক আকীদা মানহাজের কোন তানজীম গড়ে তোলা বা তাতে যোগ দেয়া নাজায়েয সাব্যস্ত হয় না। কেননা, শরীয়তের

বিধান শুধু দুয়েকটা আয়াত বা হাদিসে থেকে নেয়া যায় না, শরীয়তের বিধান নিতে হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকল আয়াত ও হাদিসের সমষ্টি থেকে। সকল আয়াত ও হাদিস একত্র করলে দেখা যাবে একটা হাদিস বাহ্যত আম, কিন্তু অন্য হাদিসের দ্বারা সেটা খাছ। আরেকটা হাদিস বাহ্যত মুতলাক, কিন্তু অন্য হাদিসের দ্বারা সেটা মুকাইয়্যাদ। এভাবে সকল আয়াত হাদিস জমা করে আম-খাছ, মুতলাক-মুকাইয়্যাদ নির্ধারণ করার পর শরীয়তের বিধান গ্রহণ করতে হয়। তখন সঠিক ফলাফল অর্জন হবে। অন্যথায় শুধু বিশেষ কিছু আয়াত বা হাদিসের দিকে তাকিয়ে বিধান গ্রহণ করে নিলে, আর বাকি আয়াত হাদিস ত্যাগ করলে ফলাফল ভুল হবে এবং গোমরাহির শিকার হতে হবে।

আমরা দেখতে পাই, অসংখ্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, পরিস্থিতি যা-ই হোক, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বীনের জন্য কিতালরত একটা দল সর্বদাই বিদ্যমান থাকবে। যাদেরকে 'তায়েফায়ে মানুসুরাহ্' বলা হয়। তাদের মাঝেই ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং সর্বশেষ তারাই দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস এসেছে। যেমন, সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - فينزل عيسى ابن مريم -ﷺ- فيقول أميرهم تعال صل لنا. فيقول لا. إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة .«

"আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। (এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) অবশেষে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম (তাদের মাঝে) অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর (অর্থাৎ ইমাম মাহদি) তাঁকে বলবেন, 'আসুন, আমাদের নিয়ে নামায পড়ান।' তিন বলবেন, না। তোমরা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরের আমীর। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের সম্মানস্বরূপ।" – **সহীহ মুসলিম: ৪১২**

এ ধরণের অসংখ্য হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা-মানহাজবিশিষ্ট একটা দল সর্বদাই কিতাল করতে থাকবে।

অন্যদিকে বিভিন্ন হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত [যেমনটা আমাদের আলোচ্য হাদিসের এ অংশ থেকেও বুঝা যায়- **فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ** -যদি তখন মুসলিমদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামাআত ও ইমাম না থাকে?] এমন একটা সময় আসবে, যখন মুসলমানদের কোন একক খলিফা থাকবে না। কিন্তু তায়েফায়ে মানুসুরার হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে, খলিফা না থাকার এ সময়েও একটা দল জিহাদরত থাকবে।

যদি খলিফা না থাকাবস্থায় যেকোন দল ও তানজীম নাজায়েয হতো, তাহলে তায়েফায়ে মানুসুরাও নাজায়েয হতো। অথচ হাদিসে এ তায়েফাকে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদরূপে বিষয় বলা হয়েছে। এ তায়েফার সাথে মিলিত হওয়ার কথা এসেছে। সকলে একমত যে, সামর্থ্য পেলে ফেতনার সময় এ তায়েফার সাথে মিলিত হতে হবে। তার সাথে মিলে কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে।

এবার যদি আমরা উভয় শ্রেণীর হাদিস সমন্বয় করি, তাহলে স্পষ্ট বুঝে আসবে, যে হাদিসে বলা হয়েছে- **فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا** , সে হাদিসে তায়েফায়ে মানুসুরা অন্তর্ভুক্ত নয়। তায়েফায়ে মানসুরার হাদিস দ্বারা এ হাদিস এবং এ ধরণের অন্যান্য হাদিস মাখসূস হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য না হয়ে বিশেষ ফেরকা তথা গোমরাহ ফেরকা থেকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) এ বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,

هذه الأحاديث وما جانسها معناها الخصوص، وليس المراد بها أن الدين ينقطع كله فى جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شىء؛ لأنه قد ثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبًا كما بدأ، وروى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: قال النبى (ﷺ)) : لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين حتى

يقاتل آخرهم المسيح الدجال) ... فبين (ﷺ) فى هذا الخبر خصوصه سائر الأخبار التى خرجت مخرج العموم. اهـ

“এ সকল হাদিস এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের দ্বারা বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য (ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়)। এমনটা উদ্দেশ্য নয় যে, দুনিয়ার সকল ভূখণ্ড থেকে দ্বীনে ইসলাম এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যে, তার কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, কেয়ামত পর্যন্তই দ্বীনে ইসলাম টিকে থাকবে। তবে দুর্বল হয়ে পড়বে। ইসলামের শুরু যামানার মতো গরীব-অসহায় হয়ে পড়বে। যেমন, হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। (এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি মাসীহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।’ ... রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ হাদিসের দ্বারা (বাহ্যত) ব্যাপকতা নির্দেশক অন্য সকল হাদিস খাছ হয়ে যাবে তথা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হবে।” – **শরহু সহীহিল বুখারী লি ইবনি বাত্তাল: ১০/৬০**

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) তিনিও একই কথা বলেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, হাদিসের নিষেধাজ্ঞা গোমরা দলের ব্যাপারে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা মানহাজ বিশিষ্ট দল গঠন করতে বা তাতে যোগ দিতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং জিহাদের প্রয়োজনে অনেক সময় তা আবশ্যক- যেমনটা অন্যান্য পোস্টে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪২১

জিহাদ না করে যিকির?

তানভির হাসান

Senior Member

১১-২২-২০১৮

“আবূদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা’আলার যিকর।

মু’আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা’আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা’আলার যিকরের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।

”মূল হাদিসটি (সুনানে তিরমিযি: ৩৩৭৭) এই-

عن أبي الدرداء ﷺ قال قال النبي صلى الله عليه و سلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى، قال: ذكر الله تعالى .فقال معاذ بن جبل ﷺ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله

এই হাদিসের কারণে অনেক ভাই বিভ্রান্তিতে পড়ে যান কারণ এ হাদিসে যিকিরকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে, অথচ জিহাদের ফজিলত সীমাহীন। এছাড়া হাদিসকে কেন্দ্র করে অনেকে জিহাদ তরকের বাহানা খুঁজতে পারে।

বিষয়টি এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে।

ধরুন কারো সৌন্দর্যের প্রশংসায় বলা হল –

তার পুরো শরীরের মধ্যে ঠোঁট দুটি সবচেয়ে সুন্দর। সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক, সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর। চোখের চেয়ে বেশী উন্মাদনা সৃষ্টিকারী, নাকের চেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী, গালের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল...

তাহলে কি এর অর্থ দাঁড়ায় সেগুলোর মোকাবেলায় এটি একা বেশী সুন্দর? নাকি সেগুলোর সাথে থেকে সুন্দর ?

এমনিভাবে আ'মালের সাথে যদি যিকির থাকে তাহলে সেটি আল্লাহর নৈকট্যের যেমন উসিলা হবে যিকির শূন্য আমাল তেমন হবেনা। যিকর শূন্য গাফেলতের নামাযের চেয়ে ইহসানের নামাযের মূল্য বেশী।

ইহছানের অর্থ কী ...?

"আল্লাহ কে আমি দেখছি /আল্লাহ আমাকে দেখছেন, এই ধ্যান নিয়ে কাজ করা"। তাই নয় কি? আপনি যদি ইহসান আদায় করতে গিয়ে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই ধ্যান নিয়ে বসে থেকে নামাযের সময় পার করে দেন, আর দলীল পেশ করেন যে,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

"নামাজ অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করে আর আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড়।

وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করো

"যেমন পাকিস্তানের যিকরি গ্রুপ নামাজ বাদ দিয়ে ৫ ওয়াক্ত যিকির করে থাকে। তাহলে আপনিই বলুন! এই ইহসানি যিকির আর যিকির বিহীন নামাযের মধ্যে 'কোনটি উত্তম' তা নিয়ে কোন প্রশ্ন হতে পারে?!

একজন 'ধ্যান' করে কিন্তু নামাজ পড়েনা, অন্যজন 'ধ্যান' ছাড়া নামাজ পড়ে, কে উত্তম ?!

জিহাদ যখন ফরযে আইন (অথবা বর্তমানের খবর না থাকার কারণে হয়তো কেউ কেউ কিফায়া বলবেন; এখন কাফি পরিমানে) সেটি আদায় হওয়া ছাড়া কেউ যদি

মন-যবান দ্বারা যিকিরে ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন আর জিহাদ তরকের ফিসকের সাথে থাকা হয়, তাহলে সে কি যিকির বিহীন মুজাহিদ থেকে উত্তম হয়ে যাবে? যিকির যেমন যবানের দ্বারা হয় তেমন অন্তর দ্বারাও হয়, আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়। এসব ধাপের মধ্যে কিছু আছে ফরজ।

যেমন কিরাত পড়া(যবানের যিকর)।

নিয়্যত করা(অন্তরের যিকর)।

রুকুসিজদা করা(অংগ প্রত্যঙ্গের যিকর)।

কোন এক প্রকারের ফরজ দিয়ে অন্য প্রকারের ফরজ আদায় করার চিন্তা করা যায়না। কোন ভাবেই এক প্রকারের ফরজ এর মুকাবিলায় অন্য প্রকারের নফল মুস্তাহাবকে দাঁড় করানো যাবে না। এখন মাথা নুইয়ে রুকু করা আর কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করা এটি ও যিকর আবার সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়া এটিও যিকর। আবার অন্তরে সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লার অর্থ খেয়াল করে ধ্যান করা সেটিও যিকির। তবে মাথা নুইয়ে পিঠ দিয়ে রুকু করা এটি ফরজ আর তাসবীহ পড়া সুন্নত...।

কোনটি উত্তম বলুন?! যখন নামাজের উদ্দেশ্যই হলো যিকির!

বলুন! নামাজের মধ্যে লম্বা কিয়াম উত্তম না লম্বা সিজদা উত্তম?

মুজতাহিদগণের সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে কিন্তু কেউ কি একটি ছেড়ে অপরটি লম্বা করার কথা বলেছেন?

যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিচ্ছেনঃ

"হে নামাজী! তোমার খুশু তোমাকে আল্লাহর যে সান্নিধ্যে পৌছাঁবে শুধু রুকু সে সান্নিধ্যে পৌছাবে না ..."

"হে মুজাহিদ! তোমার যিকির তোমার জন্য আল্লাহর যে নুসরত বয়ে আনবে তোমার আঘাতে সে কাজ হবেন..."

(আল্লাহু আলাম)

মোট কথা প্রত্যেক আমলের সাথেই যিকিরের সম্পর্ক আছে ,

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

এই আয়াতে বলা হয়েছেঃ“আল্লাহর দিকে পবিত্র বাণী (যিকর) আরোহণ করে , আর সেটি আমলে সালিহকে উন্নত করে।”

আয়াতের আরেকটি স্বীকৃত তাফসীর হলঃ “আল্লাহর দিকে পবিত্র বাণী আরোহন করে এবং আমলে সালিহ তাকে উপরে উঠায় ।”

এখন আমল বাদ দিয়ে যিকর করলে এই যিকর কাকে উপরে উঠাবে? আর যিকর ছাড়া আমল উন্নত হবে কিভাবে? প্রত্যেক আমলকারী কে বলা হচ্ছে আমলের অহমিকায় না থেকে সেটিকে আল্লাহর স্মরণে ন্যাস্ত করতে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত যিকিরের সাথে থাকতেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই হাদিস শুনে জিহাদ ছেড়ে যিকরে বসে যাননি , যেমনটি পাকিস্তানের যিকরি গ্রুপ শুরু করেছে। তারা নামাজের বিকল্প যিকরি গ্রুপ হয়েছে আর এখন কিছু লোক জিহাদের বিকল্প যিকরি হওয়ার তৎপরতায় লিপ্ত! গোমরাহি কিন্তু একই!! আল্লাহ তায়ালা সঠিক বুঝ নসীব করুন।

আমি হতে চাই খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা: এর মত রণকৌশল ও ওমর (রা: এর মত কাফেরদের প্রতি কঠোর।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৫৮১

তায়েফায়ে মানসূরা সম্পর্কে আরো দু'টি কথা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-০৪-২০১৮

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত পোস্টে আমি বলেছিলাম যে, কিতাল তায়েফায়ে মানসূরার আবশ্যকীয় সিফাত। কিতালে জড়িত হওয়া ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্যও উল্লেখ করেছিলাম। কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য থেকে সালাফের বক্তব্যসমূহের উদ্দেশ্যও বুঝা যায়।

আমার এ বক্তব্য থেকে কারো কারো সংশয় হতে পারে যে, তাহলে আলেম উলামা, যারা দ্বীনের জন্য তাদের সর্ব সামর্থ্য ব্যয় করে গেছেন, তারা কি তায়েফায়ে মানসূরা নন?

উত্তর:

বিষয়টা বুঝার আগে বুঝা দরকার- জিহাদ কাকে বলে?

আমরা জানি, জিহাদ একটি ব্যাপক আমল। এখানে অনেক শ্রেণী ও ভাগ থাকে। একদল সরাসরি কিতালে থাকেন। বাকিরা জিহাদের প্রয়োজনমাফিক অন্যান্য কাজে থাকেন। কেউ চিকিৎসা বিভাগে থাকেন। কেউ অস্ত্র তৈরিতে থাকেন। কেউ অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখাশুনা করেন। কেউ মিডিয়ার কাজ করেন। কেউ কিতাব লেখা ও রচনায় থাকেন। কেউ ফতোয়া দেয়া ও মাসআলা মাসায়েল বয়ানে থাকেন। এভাবে বিভিন্নজন বিভিন্ন কাজে রত থাকেন। তাদের এ কাজগুলোর সবগুলোই জিহাদে শামিল। সবাই নিজ নিজ মেহনত ও প্রয়োজন অনুসারে সওয়াব পাবেন। সকলেই মুজাহিদ।

অতএব, যেসকল আলেম উলামা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মাসায়েল বলা ও খেদমত করার পাশাপাশি জিহাদের বিষয়েও ফতোয়া দিচ্ছেন বা লেখালেখি করছেন, তারাও মুজাহিদ। তারাও তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত। যারা সরাসরি কিতালে আছেন, তারা যেমন তায়েফায়ে মানসূরা, যারা জিহাদের সাথে জড়িত হয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে লিপ্ত আছেন, তারাও তায়েফায়ে মানসূরা।

দ্বিতীয়ত: সহীহ হাদিসে এসেছে, **'যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের খরচ সরবরাহ করলো, সেও জিহাদ করলো।'**

একজন জান দিয়ে করলো, আরেকজন মাল দিয়ে করলো। একজন প্রত্যক্ষভাবে করলো, আরেকজন পরোক্ষভাবে করলো। এভাবে যে কেউ যেকোন ভাবে জিহাদে সহায়তা করলো, তারাও পরোক্ষভাবে মুজাহিদ। তারাও পরোক্ষভাবে তায়েফায়ে মানসূরা।

তৃতীয়ত: হকপন্থী আলেম উলামারা কোন সময় জিহাদবিরোধী হতে পারেন না। জিহাদবিরোধী হলে আর হকপন্থী থাকে না। তাহলে যারা হকপন্থী আলেম, তারা সরাসরি জিহাদে না গেলেও জিহাদের সমর্থক হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে জিহাদে শরীক আছেন। এ হিসেবে তারাও পরোক্ষভাবে তায়েফায়ে মানসূরায় পড়েন।

এ হিসেবে আমরা বলতে পারি, যারা সরাসরি কিতালে আছেন বা সরাসরি জিহাদের কাজে লিপ্ত আছেন- চাই ইলমী কাজই হোক না কেন- তারা সরাসরি তায়েফায়ে মানসূরা। আর যারা সরাসরি জিহাদে লিপ্ত নেই, সহায়তায় আছেন কিংবা সমর্থন করছেন, তারাও পরোক্ষভাবে তায়েফায়ে মানসূরা।

অধিকন্তু বলতে গেলে, আহলুস সুন্নাহর প্রকৃত আকীদা বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তি কোনভাবেই জিহাদ বিরোধী হতে পারে না। তারা- ফরযে আইন না হলে- জিহাদ না করলেও বা সহায়তায় না থাকলেও সমর্থক হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে তারাও তায়েফায়ে মানসূরা। এ হিসেবে যদি বলা হয় যে, আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা, তাহলে তাও ঠিক আছে।

তাহলে বলা যায়, যারা সরাসরি জিহাদ বা কিতালে আছেন, তারা সরাসরি তায়েফায়ে মানসূরা। আর আলেম উলামা ও প্রকৃত আহলুস সুন্নাহগণ, তারা সরাসরি জিহাদে না থাকলেও সহায়তার মাধ্যমে কিংবা সমর্থনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জিহাদে জড়িত আছেন। তারাও পরোক্ষভাবে তায়েফায়ে মানসূরা। এ হিসেবে সালাফের যারা বলেছেন যে, তায়েফায়ে মানসূরা হলো- আহলে ইলম, আহলুল হাদিস বা আহলুস সুন্নাহ: তাদের কথায় কোন বৈপরীত্ব নেই।

মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

نعم هذه الأحاديث شاملة للعلماء أيضا حتى قيل المراد بهم علماء الحديث والله أعلم. اهـ

"হ্যাঁ, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসগুলো (মুজাহিদগণের পাশপাশি) উলামায়ে কেরামকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি এও বলা হয় যে, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা উদ্দেশ্য- হাদিস বিশেষজ্ঞ উলামাগণ।"- মিরকাত ৬/২৬৬২

এ কথাগুলো তায়েফায়ে মানসূরার সংক্রান্ত আগের পোস্টেই বলা দরকার ছিল। আমার মাথায় সেগুলো ছিল। বিভিন্ন কারণে বলতে পারিনি। পরে দেখলাম, এ থেকে কারো কারো সংশয় হচ্ছে যে, আমরা সালাফের পথ পরিত্যাগ করে নিজেরা মনমতো ব্যাখ্যা করছি। এ সংশয় দূর করার জন্য এখন বলে দিচ্ছি। আমরা সালাফের পথ ছাড়িনি। সালাফের বক্তব্যসমূহের সহীহ ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছি। এতে হাদিসের সাথে সালাফের বক্তব্যসমূহের আর দ্বন্ধ থাকে না। ফালিল্লাহিল হামদ।

এখানেআরো দুটিকথাবলেদেয়ামুনাসিবমনেকরছি:

এক.

তায়েফায়ে মানসূরার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট যদিও কিতাল, কিন্তু এটাই তাদের একমাত্র বৈশিষ্ট নয়। গোটা দ্বীনই তাদের কর্মের পরিধি। গোটা দ্বীনের জন্যই তাদের মেহনত-মুজাহাদা-কুরবানী। অতএব, তারা কিতালে যেমন লিপ্ত থাকবেন, পাশাপাশি দ্বীনের অন্যান্য কাজেও লিপ্ত থাকতে পারেন। শিরক, বিদআন, ইলহাদ, যান্দাকাসহ সকল বাতিলের বিরুদ্ধে তারা কাজ করে যেতে পারেন। উভয়টার মাঝে কোন বৈপরীত্ব নেই।

দুই.

তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা যা-ই উদ্দেশ্য হোক, এতটুকুতে তো সকলেই একমত যে, হকপন্থী মুজাহিদগণ অবশ্যই তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত। তারা তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আশাকরি কারো কোন দ্বিমত নেই। আলেম উলামা যারা জিহাদে সরাসরি জড়িত নন, তারা তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত কি'না সেটাতে দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু মুজাহিদগণ যে, তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত, তাতে আশাকরি কারো দ্বিমত নেই।

আবার এতটুকুতেও কোন দ্বিমত নেই যে, খেলাফত না থাকার সময়ও তায়েফায়ে মানসূরা বিদ্যমান থাকবে।

যদি তায়েফায়ে মানসূরাকে ব্যাপকার্থবোধক ধরা হয়, তাহলে অন্তত এতটুকু বলা যায় যে, খেলাফত না থাকার সময় জিহাদি জামাত থাকতে পারে। খেলাফত না থাকাবস্থায় আলেম উলামা যেমন থাকতে পারেন, জিহাদি জামাতও থাকতে পারে। তায়েফায়ে মানসূরাকে ব্যাপাকার্থে ধরার এবং আলেম উলামাদেরকেও কিংবা গোটা আহলুস সুন্নাহকেই তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত ধরার অর্থ তো এই নয় যে, মুজাহিদগ তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত নন। বরং অর্থ- মুজাহিদগণের পাশাপাশি অন্যরাও হতে পারেন।

যদি এমনটাই হয়, তাহলে বলতে হবে, যখন খেলাফত থাকবে না, তখন জিহাদরত মুজাহিদ জামাত ও তানজীম –আবশ্যিকভাবে সর্বদা বিদ্যমান না থাকলেও- বিদ্যমান থাকাতে কোন বাধা নেই। অতএব, খেলাফত না থাকাবস্থায় মুজাহিদ জামাত থাকতে কোন অসুবিধা নাই। গঠন করতেও কোন অসুবিধা নাই।

মোটকথা, তায়েফায়ে মানসূরার অর্থ যাই ধরা হোক না কেন, এ থেকে এতটুকু সকলের ঐক্যমতে সাব্যস্ত হবে যে, খেলাফত না থাকাবস্থায় আহলুস সুন্নাহর আকীদা মানহাজ বিশিষ্ট জিহাদি তানজীম গঠন করতে কোন বাধা নেই। ফিতনা অধ্যায়ের হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সকল দলমত পরিত্যাগ করার হাদিসকে তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসগুলোর সাথে মিলালে বলা যায়, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে যেসব দল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে সেগুলো গোমরাহ, ভ্রান্ত ও আহলুস সুন্নাহর বহির্ভূত দল উদ্দেশ্য। হক দল বা তানজীম ত্যাগ করা উদ্দেশ্য নয়।

আমি আমার সামর্থ্যানুযায়ী বিষয়টা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কারো কাছে আমার কোন ভুল ধরা পড়লে আমাকে অবগত করলে আমি শুকরিয়া আদায় করব। নিজেকে শুধরে নেবো। আর সঠিক *বুঝ দেয়ার মালিক তো এক আল্লাহ তাআলা।

হে আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬৮৯

নির্বাচন: প্রার্থী, ভোট ও ভোটারের শরয়ী বিধান

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-২৪-২০১৮

প্রার্থী

প্রথমত:

যে কোন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে, তাকে অবশ্যই এ বলে মনোনয়ন নিতে হবে যে, সে সংবিধন বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করবে। অধিকাংশ সংসদ সদস্য যে আইনে সম্মত হবে, সেটাই হবে আইন। সেটাকে সম্মান ও ইহতিরামের সাথে বাস্তবায়ন আবশ্যক হবে। এ শপথ নিয়েই তাকে মনোনয়ন নিতে হবে।

অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে বহাল থাকা আইন বাস্তবায়ন করা এবং শরীয়ত বিরোধী নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করার শপথ ও অঙ্গীকার করে মনোনয়ন নিতে হবে। আর স্পষ্ট যে, এটি সর্বসম্মতভাবে কুফর। যে ব্যক্তি এমনটা করবে, সে সর্বসম্মতভাবে কাফের।

আর প্রার্থী হওয়ার অর্থ নির্বাচনে জয়লাভ করলে কাফের হয়ে যাবে- এই অঙ্গীকার করা। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে কাফের হয়ে যাবে বলে ইচ্ছা করেছে, সে এখনই কাফের হয়ে যাবে। অতএব, সংসদীয় নির্বাচনে যত প্রার্থী দাঁড়িয়েছে- পাস করুক আর ফেল করুক- সকলে ইতোমধ্যে কাফের হয়ে গেছে। পাস করার পর যখন শরীয়ত বিরোধী আইনগুলো বহাল রাখবে এবং নতুন নতুন শরীয়ত বিরোধী আইন করবে, তখন কুফর আরো বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় প্রার্থী হওয়ার সাথে সাথেই ইতোমধ্য কাফের হয়ে গেছে।

ইসলামী দলের প্রার্থীর বিধান

যে কুফরের কথা উপরে বলা হয়েছে, সে কুফরে ইসলামী প্রার্থীও লিপ্ত। এ হিসেবে তারাও কাফের হয়ে যাওয়ারই কথা। তবে তাদের তাবিলের কারণে- যদিও ভুল তাবিল হয়- আমরা তাদেরকে কাফের বলবো না। গোমরাহ ও হারামে লিপ্ত বলবো। আর তাদের বাকি হিসাব-নিকাশ আল্লাহর সাথে হবে।

দ্বিতীয়ত:

নির্বাচনে দাঁড়ানোর অর্থ: দেশব্যাপী অনাচার, অবিচার, খুন-খারাবী, সন্ত্রাসী, ডাকাতি, যিনা ব্যভিচার ও যাবতীয় অপকর্মের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। তবে বেশ-কম এতটুকু যে, আওয়ামী লীগ একটু বেশি করবে, বিএনপি একটু কম করবে। আর ইসলামী দল বিএনপির সমান বা কাছাকাছি করবে। তবে ব্যবধান হল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এগুলোকে হালাল ও বৈধ মনে করে করবে আর ইসলামী দল তাবিলের ভিত্তিতে বা হারাম মনে করে করবে। অর্থাৎ সকল দলই সব ধরণের অন্যায় অনাচার করবে, তবে ইসলামী দল একটু কম করবে এবং তাবিলের সাথে বা হারাম মনে করে করবে। ইসলাম কায়েম কারো দ্বারাই হবে না।

তাহলে প্রার্থী হওয়ার অর্থ হলো-

ক. নিজেকে বিধানদাতা ও রবরূপে দাঁড় করানো এবং এজন্য জনগণের সমর্থন ও সহায়তা কামনা করা।

খ. কাফের হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা এবং কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের সমর্থন ও সহায়তা কামনা করা।

গ. সব ধরণের অন্যায় অনাচারের অঙ্গীকার করা এবং জনগণের কাছে এ জন্য সমর্থন ও সহায়তা কামনা করা।

ভোট

ভোটের অর্থ-

ক. কুফর প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন দেয়া।

খ. আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্য ভিন্ন মা'বূদ ও বিধানদাতা নির্ধারণের পক্ষে রায় দেয়া।

গ. সব ধরণের অন্যায় অনাচারের পক্ষে রায় দেয়া।

ভোটার

ক. কুফরের সমর্থক ও সহায়ক।

খ. আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাখলুককে মা'বূদ ও বিধানদাতারূপে গ্রহণকারী।

গ. সব ধরণের অন্যায় অনাচারের সমর্থক ও সহায়ক।

তাহলে স্পষ্ট, ভোট একটি কুফরী ও হারাম কাজ।

তবে আমরা জনগণকে কাফের বলতে পারবো না বিশেষত দুই কারণে-

ক. ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে অজ্ঞতা বিদ্যমান। যেসব মাসআলা আমরা বুঝতে পারছি, সেগুলো তাদের জানা নেই। আর সমাজটাও এমন যে, এখানে আলেমদের বিশাল অংশও মাসআলাগুলো বুঝে না। জনগণের কথা তো বলাই বাহুল্য। অতএব, উজর বিল জাহলের কারণে আমরা তাকফির করবো না।

খ. ব্যাপকভাবে তাবিল বিদ্যমান। জনগণ এ নিয়তে ভোট দেয় না যে, তারা কুফর বা হারামের সমর্থন করছে। অনেকে জানেও না যে, সংসদ সদস্যদের কাজ কি। তারা শুধু এতটুকু বুঝে যে, অমুক এমপি হলে উন্নয়ন হয় বেশি। অমুক হলে দ্বীনের কাজে সহায়তা করবে। অমুক হলে করবে না। অমুক হলে রাস্তাঘাট হয়। ভাতা-টাতা পাওয়া যায়। ইত্যাদি দুনিয়াবি সুবিধা। এ তাবিলের কারণে তাকফির করা যাবে না। তবে একান্তই যারা সব কিছু বুঝে এবং বুঝে শুনে ও কুফর বাস্তবায়নের জন্য ভোট দেবে- বিশেষত উচ্চ পর্যায়ের দলীয় ব্যক্তিরা- তারা কাফের হয়ে যাবে।

সারকথা

♣ সংসদীয় নির্বাচনের সকল প্রার্থী কুফরে লিপ্ত। তবে ইসলামী দলের প্রার্থীদেরকে তাবিলের কারণে কাফের বলবো না। বাকিরা কাফের।

♣ ভোট একটি হারাম ও কুফরি কাজ। তবে জনগণের জাহালত-অজ্ঞতা ও তাবিলের কারণে তাদের তাকফির করা হবে না।

বিশেষ আবেদন

তাকফিরের মাসআলা অনেক জটিল। ভাইদের কাছে আবেদন, আমরা জনগণের তাকফিরের পেছনে পড়বো না। আমাদের উচিৎ জনগণকে এ কুফর ও হারাম সম্পর্কে দরদ ও হেকমতের সাথে বুঝানো। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৭৫

ইসলামি গণতন্ত্রীদের আরেকটি ধোঁকা ও অলীক কল্পনা :

saif abdullah

Moderator

১২-৩১-২০১৮

কিছু ভাই মনে করেন, গণতন্ত্র কুফরি তন্ত্র, এটা আমরা স্বীকার করি। তবে বর্তমান যুগে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেহেতু গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছাড়া কোনো উপায় নেই, তাই আমরা এটাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাব। প্রথমেই যেটা আমরা করব, তা হলো, সংসদের কুফরি সিস্টেমকে আমরা উৎখাত করে ফেলব। সংসদে শরিয়তের নির্ধারিত কোনো আইন নিয়ে ভোটাভুটি হবে না; বরং শরিয়তের আইনই অটোমেটিক আইন বলে বিবেচিত হবে। দ্রুত সংবিধান সংশোধন করে এ আইন পাশ করে ফেলব যে, শরিয়তের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো আইন বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এমনটা করলে এতে আর কুফর থাকছে না। সুতরাং এর মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ত কায়েম করতে কোনো বাধা নেই।

আমি বলি, বাহ্যত চমকপ্রদ পরিকল্পনা ও শক্তিশালী দলিল মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু পর্যালোচনা করে দেখতে তো দোষ নেই। আসুন দেখি, এতে কী কী সমস্যা রয়েছে:

এক : তাদের উক্তি //তবে বর্তমান যুগে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেহেতু গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছাড়া কোনো উপায় নেই//

আমি বলি, এটা চরম এক ভ্রান্তি ও শরিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফসল। আপনি যখন স্বীকার করলেন, গণতন্ত্র হলো কুফরি তন্ত্র, তাহলে আপনার উপরিউক্ত মন্তব্য বলে কি এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহ উম্মতকে ব্যাপকভাবে এমন এক সংকটে ফেলেছেন, কুফরের পথ মাড়ানো ছাড়া যা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় নেই? এমনটা চিন্তা করাও তো আল্লাহর শানে চরম ধৃষ্টতার শামিল।

আপনাদের কাছে ক্ষমতায় যাওয়াটাই মূখ্য বিষয়, নাকি আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা? যদি প্রথমটা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার পথ ও পদ্ধতি ঠিক আছে, তবে এটাকে ইসলাম বলে প্রচার করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। করলে তা হবে মুসলমানদের সাথে স্পষ্ট প্রতারণা। আর যদি দ্বিতীয়টিই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়ে

থাকে, তাহলে তো গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছাড়াই আল্লাহ নির্দেশিত জিহাদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এটা শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই নয়; বরং বর্তমান সময়ের অপ্রকাশিত চরম এক সত্য, তাগুতি মিডিয়ার ষড়যন্ত্রে যার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ অনবগত ও উদাসীন।

দুই : তাদের উক্তি //তাই আমরা এটাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাব।//

আমি বলি, কুফরকে কখন মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যাবে আর কখন গ্রহণ করা যাবে না, সেজন্য শরয়ি মূলনীতির গ্রন্থগুলোতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। শরয়ি ইকরাহ ছাড়া এবং একান্ত বাধ্য না হলে কি কুফরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি অনুসরণীয় কোনো ফকিহ দিয়েছেন? দিয়ে থাকলে তার নাম, কিতাবের নাম ও উদ্ধৃতি পেশ করুন। আর ইকরাহ ও একান্ত বাধ্য না হলে কুফরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি না থাকলে বলুন, আপনাদের গণতান্ত্রিক কুফরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ইকরাহ পাওয়া গিয়েছে, যদ্দরুন এটা জায়েজ হয়ে যাচ্ছে?
আপনারাই তো বলেন, এটা মন্দের ভালো হিসাবে করছি। এটা আদৌ মন্দের ভালো কিনা, সেটা ভিন্ন একটি বিষয়। এটা নিয়ে আলাদা পোস্টে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের এ মন্তব্যেই তো প্রমাণ হয়ে যায়, এটা ইকরাহ নয়; বরং কল্যাণকামিতা বা মাসলাহাত। শুধু কল্যাণকামিতা বা মাসলাহাতের জন্য কি কুফরি মাধ্যম গ্রহণ করার অনুমতি আছে? আমার জানামতে তো এর জন্য কুফরকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে আপনারা কীসের ভিত্তিতে এটাকে মাধ্যম বলে বিষয়টি হালকা করার অপচেষ্টা করছেন???

তিন : তাদের উক্তি //প্রথমেই যেটা আমরা করব, তা হলো, সংসদের কুফরি সিস্টেমকে আমরা উৎখাত করে ফেলব। আর সংসদে শরিয়তের নির্ধারিত কোনো আইন নিয়ে ভোটাভুটি হবে না; বরং শরিয়তের আইন অটোমেটিক আইন বলে বিবেচিত হবে। এমনটা করলে এতে আর কুফর থাকছে না।//

আমি বলি, এটা জাস্ট আপনাদের অলীক একটি কল্পনা মাত্র, যা কোনোদিনও বাস্তবায়ন হওয়ার নয়। তাছাড়াও আরেকটি কথা বলুন তো, এই যে আইন বা সংশোধন করার কথা বলছেন, এটার জন্যও তো প্রথমে গণতান্ত্রিক কুফরি

সিস্টেমেই ভোটাভুটি করতে হবে। এটার জন্যও তো শরয়ি অনুমোদন থাকতে হবে। এখানে কি সে অনুমোদন আছে? আর এ সংশোধনের নিশ্চয়তাই বা কয়দিনের? আপনাদের পরে অন্যরা এসে তো এটা আবার পরিবর্তন করে দেবে। বিষয়টি এমন হয়ে গেল না, যে কিছু কাল ইসলামি আইনে দেশ চলবে। আর কিছু কাল কুফরি সিস্টেমে দেশ চলবে? এটার বিপরীতই কি সুরা কাফিরুন নাজিল হয়নি? এখানে কি পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়নি যে, কুফর ও ইসলামের মাঝে কোনো আপোষ নেই? আল্লাহর রাসুল সা. কি এ আপোষের মাধ্যমে মক্কায় ইসলাম কায়েম করতে পারতেন না? তাহলে আপোষহীন ইসলামকে আপনারা আপোষের ইসলাম প্রমাণ করতে চাচ্ছেন কেন? বিশ্বের কাছে ভুল ও বিকৃত ইসলাম কেন প্রচার করছেন? এটা আপনাদের ইসলাম হতে পারে, আল্লাহ কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সা.-এর ওপর নাজিলকৃত ইসলাম নয়।

চার : তাদের উক্তি //দ্রুত সংবিধান সংশোধন করে এ আইন পাশ করে ফেলব যে, শরিয়তের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো আইন বাতিল বলে বিবেচিত হবে।//

আমি বলি, আপনাদের সংবিধান ও গণতন্ত্র বিষয়ক পড়াশোনা খুবই সীমিত মনে হয়। আপনারা এটাও জানেন না, সংবিধানের সব অনুচ্ছেদই সংশোধন করা যায় না। যেমন উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে :

"এই সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয় যা সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ তে বলা হয়ছে সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদের বিধানবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।"

সুতরাং আপনারা যদি আপনাদের ভাবনা বাস্তবায়ন করতে চান তাহলে তো গণতন্ত্রই থাকছে না। সেটা তো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর হলো।

গণতান্ত্রিক সিস্টেমে থেকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কীভাবে এ্যাকশন নিবেন? আদালত, সেনাবাহিনী, জনগণ কেউ কি এটা মেনে নেবে? এর চাইতে তো খিলাফত ঘোষণা করাই অধিক সহজ। এমন অবাস্তব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চিন্তা করেন কীভাবে?

আর গণতন্ত্রের মানসপুত্ররাই বা আপনাদের এমন আইন কেন করতে দেবে? আমেরিকা, ব্রিটেন কি বসে থাকবে ভাবছেন?? আপনাদের কি এমন সক্ষমতা অর্জন হয়েছে, যদ্বারা আপনি এসব শক্তির মোকাবেলা করতে পারবেন???

বেশি না, কিছুদিন আগের শুধু মিসরের অবস্থাটাই দেখুন। মুসলিম ব্রাদারহুড আপনাদের চেয়ে অর্থ, কৌশল, সমর্থন, অভিজ্ঞতা সবদিক থেকে শতগুণ শক্তিশালী। কিন্তু গণতান্ত্রিক সিস্টেমে এসে কয়দিন টিকতে পারল? এক বছরও নয়। কেন? কারণ, তারাও আপনাদের মতো ভুল চিন্তায় বিভোর ছিল। বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার পর এখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারছে। এদের থেকে কি আপনারা শিক্ষা নিবেন না? যতদিন না কুফরের মূলে আঘাত করবেন, যতদিন না তাদের শক্তি দুর্বল করতে পারবেন, ততদিন যতই সুষ্ঠু নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেন না কেন, এক বছরও টিকতে পারবেন না। তাই এমন অলীক কল্পনা বাস্তবায়নের চিন্তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর নির্দেশিত সঠিক পথে ফিরে আসুন। বিজয় তো আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।

মূলত, গণতন্ত্র মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া এমন একটি জঞ্জাল, যা থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু এ লোহার জিঞ্জির যতদিন আমরা ভাঙতে পারব না ততদিন খিলাফাহ নাম সোনার হরিণের দেখাও পাব না।

শেষ একটি আয়াত বলে আলোচনা শেষ করছি। হয়তবা এ একটি আয়াতই আপনার অন্তর্চক্ষু খুলে দিতে পারে। একটু গভীরভাবে খেয়াল করে বারংবার পড়ুন আর ভাবুন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম ও রীতিনীতির অনুসরণ করেন। (সুরা বাকারা: ১২০)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯২৭

তায়েফায়ে মানসূরা: বিভ্রান্তির নিরসন, বাস্তবতার উন্মোচন

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৪-২০১৮

তায়েফায়ে মানসূরা:
বিভ্রান্তির নিরসন, বাস্তবতার উন্মোচন

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد

...

কিছু দিন যাবৎ কয়েকটা আইডি থেকে জিহাদি তানজীম নাজায়েজ প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। দুয়েকজন ব্যক্তির পদস্খলনসহ দুয়েকটি হাদিস ও আইম্মায়ে কেরামের কিছু বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। আলহামদু লিল্লাহ! ফোরামের হকপন্থী ভাইদের প্রতিবাদ ও খণ্ডনের সামনে এ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আসলে আল্লাহ তাআলা যখন পরিবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন শত বাধাও তা ঠেকাতে পারে না। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর সন্তানদের মাঝে – বিশেষত যুবকদের মাঝে – এমন এক জোয়ার সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, বাতিল তাতে কচুরিপানার মতো ভেসে যেতে বাধ্য। ফালিল্লাহিল হামদ।

বিশেষ করে হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্যের ভুল ব্যাখার মাধ্যমে এ প্রয়াস চলেছিল। আলহামদু লিল্লাহ! আমরা হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যা এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরেছি। জিহাদি তানজীম গঠন জায়েয, বরং আবশ্যক হওয়ার দলীল প্রমাণও তুলে ধরেছি। এরপর আশাকরি ভাইদের মাঝে কোন সন্দেহ থাকবে না। সংশয় সৃষ্টিকারীদের খণ্ডনকল্পে তাদের কাছে কিছু ইলজামি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা সেগুলোর কোনটারই কোন সহীহ জওয়াব দিতে সমর্থ্য হয়নি।

প্রশ্নগুলো মৌলিকভাবে এরকম ছিল:

ক. জিহাদের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসের কি ব্যাখ্যা?খ. উম্মাহর উপর কাফেরদের আগ্রাসন হলে জিহাদ ফরযে আইন- এর কি ব্যাখ্যা?

গ. শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয- এর কি ব্যাখ্যা?

ঘ. তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস; তথা যেসব হাদিসে এসেছে যে, একটা দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করতে থাকবে- এগুলোর কি ব্যাখ্যা?

ঙ. খেলাফত না থাকার সময়ে যেসব জিহাদ হয়েছে – বিশেষত তাতারদের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে – সেগুলোর কি বিধান?

মৌলিকভাবে এ প্রশ্নগুলো তাদের করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর কোন জওয়াব দিতে পারেনি। অবশেষে মূল প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য একটি বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে। সেটা হল, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস। আমরা বলেছিলাম, তায়েফায়ে মানসূরা একটা দল সব সময় হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে। এটা দলীল যে, খেলাফত না থাকার সময়েও জিহাদি তানজীম গঠন করা যাবে। সংশয় সৃষ্টিকারীরা এতে আপত্তি জানিয়ে বিষয়টিকে ভিন্ন দিকে ঘুরানোর চেষ্টা করেছে। হাদিসে যদিও স্পষ্ট এসেছে যে, তায়েফায়ে মানসূরা যে দলটি হবে, সেটি একটি জিহাদি দল- এতদসত্ত্বেও তারা দাবি করছে, তায়েফায়ে মানুসূরা কোন জিহাদি দল নয়। বরং তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে, আলেম উলামা। তারা এ দাবিটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে করেছে এবং আমাদের উপর আপত্তি করেছে যে, আমরা সালাফের ব্যাখ্যা প্রত্যাখান করে নিজে থেকে মনমতো ব্যাখ্যা করছি।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তানজীম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শুধু তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসই দলীল নয়। এর পক্ষে অনেক দলীল প্রমাণ আছে, যেগুলো ফোরামে আলোচিত হয়েছে। এতএব, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস যদি বাদও দিই, তাহলেও আমাদের দাবিতে কোন ফরক পড়ে না। তবে যেহেতু একটা ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে এবং বিষয়টি জিহাদের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, এ কারণে এর সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। যাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি আমাকে প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচন করে সত্যটি ফুটিয়ে তোলার তাওফিক দান করেন।

তায়েফায়ে মানসূরা কারা?

তায়েফায়ে মানসূরার ব্যাপারে যেসব হাদিস এসেছে, সেগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। অর্থাৎ এ বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবী থেকে – বলা হয় ২০ জন সাহাবী থেকে – এত অধিক পরিমাণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তায়েফায়ে মানসূরা একটা দল কেয়ামত অবধি দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকবে।

জিহাদ ছাড়া কি তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব?

সংশয়বাদিদের দাবি হচ্ছে, তায়েফায়ে মানসূরা মূলত কোন জিহাদি দল নয়। তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে: উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন প্রমুখ। কিন্তু সাধারণ আরবী বুঝে এমন কোন ব্যক্তিও যদি তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসগুলোর দিকে তাকায়, তাহলে অনায়াসে বুঝতে পারবে, তায়েফায়ে মানসূরা মূলত একটা জিহাদি দল। তারা হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে। তাদের মাঝে উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, সাধারণ মুসলমান- সকলেই থাকতে পারেন। সকলে মিলেই এ তায়েফায়ে গঠিত। জিহাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ায় রত। যারা জিহাদে জড়িত নন- তারা উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন যাই হোন না কেন, তায়েফায়ে মানসূরা নন। তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এবং হকপন্থী হতে পারেন, কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরা নন। তায়েফায়ে মানসূরা উম্মাহর আহলুস সুন্নাহর একটা অংশ। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নন। আহলুস সুন্নাহর যারা হক জিহাদে লিপ্ত, তারাই কেবল তায়েফায়ে মানসূরা। অন্যরাও আহলুস সুন্নাহ এবং হকপন্থী, কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরা নন। তায়েফায়ে মানসূরা হতে হলে জিহাদে জড়িত হতে হবে। হাদিসে বিষয়টা সুস্পষ্ট।

সারকথা:

- তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর একটা অংশ। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নন। আহলুস সুন্নাহর যারা হক জিহাদে জড়িত, তারাই কেবল তায়েফায়ে মানসূরা।

- কেউ তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ ও আহলে হক থেকে বহিষ্কৃত। যদি আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার

ভিন্ন কোন কারণ না থাকে, তাহলে তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আহলুস সুন্নাহ হতে পারেন।

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত হাদিস

উপরোক্ত কথাগুলো বুঝার পর আমরা তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত কিছু হাদিসের দিকে নজর দিই। ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ইমারাতে এ সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেছেন। কিতাবুল ঈমানেও একটি হাদিস এনেছেন। প্রথমে সহীহ মুসলিমের হাদিসগুলো উল্লেখ করছি। তারপর অন্যান্য কিতাব থেকে কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছি।

হাদিস ১:

»لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - فينزل عيسى ابن مريم -ﷺ- فيقول أميرهم تعال صل لنا. فيقول لا. إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة .«

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাদের শত্রুদের উপর) হবে প্রতাপশালী। (এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) অবশেষে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম (তাদের মাঝে) অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর (অর্থাৎ ইমাম মাহদি) তাঁকে বলবেন, ‘আসুন, আমাদের নিয়ে নামায পড়ান।’ তিন বলবেন, না। তোমরা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরের আমীর। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের সম্মানস্বরূপ।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৪১২

হাদিস ২:

»لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة .«

“এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২

হাদিস ৩:

«لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.»

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাদের শত্রুদের উপর) হবে প্রতাপশালী।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৩

হাদিস ৪:

«من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة»

“আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনি ইলমের সঠিক বুঝ দান করেন। আর মুসলমানদের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৫

হাদিস ৫:

« لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك »

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের উপর কেয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৬

এগুলো মুসলিম শরীফের হাদিস। সবগুলো হাদিসেই এসেছে যে, তারা কিতাল করতে থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন,

হাদিস ৬:

»لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.«

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী। (এ ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।” – সুনানে আবু দাউদ, বাবু: ফি দাওয়ামিল জিহাদ, হাদিস নং ২৪৮৬

ইমাম নাসায়ী রহ. বর্ণনা করেন,

হাদিস ৭:

عن سلمة بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله ﷺ فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله ﷺ بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة [المجتبى من السنن للنسائي: 3561]

“হযরত সালামা ইবনে নুফাইল আলকিন্দি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজন ঘোড়া গুটিয়ে নিয়েছে। অস্ত্র রেখে দিয়েছে। বলছে, এখন আর কোন জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারা মোবারকসমেত আমাদের দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন, ‘তারা ভুল বলেছে। এখন তো মাত্র কিতালের যামানা শুরু হল। আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। তাদের সাথে কিতালের জন্য আল্লাহ তাআলা কতক সম্প্রদায়ের

অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন এবং এদের থেকে তাদেরকে রিযিক দেবেন। কিয়ামত অবধি এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সালাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু'মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্তই এই ধারাবাহিকতা চলবে। আর (শুনে রাখ,) কিয়ামত অবধিই ঘোড়ার অগ্রকেশে কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে'।" – সুনানে নাসায়ী (সুগরা); হাদিস নং ৩৫৬১

উপরোক্ত সবগুলো হাদিসেই আমরা দেখেছি, তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ যে সিফাতটি বলা হয়েছে, তা হলো, তারা কিতাল করতে থাকবে। অতএব, কিতালবিহীন কোন দল তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারে না। সামনে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

***

তায়েফায়ে মানসূরার উপরোক্ত হাদিসগুলো দেখার পর এবার আমরা এগুলো থেকে সাব্যস্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করবো:

এক.

হকপন্থী একটা দল সর্বদাই জিহাদ করতে থাকবে

তায়েফায়ে মানসূরার উপরোক্ত হাদিসগুলোতে এ কথাটি দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, হকপন্থী একটা দল সর্বদাই কিতালরত থাকবে। খেলাফত থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল কিতাল করতে থাকবে।

পূর্বোক্ত ২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪ হি.) বলেন,

لا يخلو وجه الأرض من الجهاد إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى. اهـ

"ভূপৃষ্ঠ কখনোই জিহাদশূন্য হবে না। এক ভূখণ্ডে না হলে অন্য ভূখণ্ডে হবে।" – শরহুল মাসাবিহ লি ইবনিল মালাক: ৪/৩১২

আল্লামা তিবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

وفيه معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله تعالي من زمن النبي ﷺ إلي الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله تعالي. اهـ

"এ হাদিস একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে এখন পর্যন্ত সর্বদাই এই অবস্থাটি চলে আসছে এবং

আল্লাহ তাআলার ফায়সাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু'মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্ত চলতেই থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৩২

উপরোক্ত ৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

((يقاتل آخرهم المسيح الدجال)) أي لا تنقطع تلك الطائفة المنصورة، بل تبقى إلي أن يقاتل آخرهم الدجال. اهـ

"তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে। অর্থাৎ ঐ তায়েফায়ে মানসূরা কখনোও বিলুপ্ত হবে না। বরং তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে কিতাল করা পর্যন্তই তারা বিদ্যমান থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৪৪

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق. اهـ

"কোনো যামানাই উক্ত তায়েফাশূন্য হবে না। প্রত্যেক যামানাতেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত উক্ত তায়েফাটি বিদ্যমান থাকবে।" – ফায়জুল বারী; ১/১৭১, কিতাবুল ইলম, বাব: মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ..., ছাপা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেউবন্দ

খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম বৈধ

তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস এবং মুহাদ্দিসিনে কেরামের ব্যাখ্যা থেকে দেখলাম, একটা হকপন্থী দল সর্বদা জিহাদ করতেই থাকবে। অপরদিকে বিভিন্ন হাদিস থেকে প্রমাণিত, এমন এক সময় আসবে, যখন খেলাফত থাকবে না। যেমন, বর্তমানে নেই। উভয় শ্রেণীর হাদিস সমন্বয় করলে ফলাফল দাঁড়ায়, খেলাফত না থাকাবস্থায়ও একটা হকপন্থী দল কিতালরত থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম গঠন ও তাতে যোগ দেয়া বৈধ। এমন সুস্পষ্ট বিষয়টি যারা অস্বীকার করতে চায়, তাদের জন্য বড়ই আপসোস!

দুই.

তায়েফায়ে মানসূরা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত

হাদিসে তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কেয়ামত অবধিই তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট যে, তারা কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহর একটা জামাত হবে। এও স্পষ্ট যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হলে হক বুঝা জরুরী। অতএব, তায়েফায়ে মানসূরা এমন একটি দল হবে, যাদের মাঝে দ্বীনের সঠিক বুঝসম্পন্ন আহলুস সুন্নাহর বিশিষ্ট আলেম উলামা, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফুকাহা থাকবেন, যারা এ দলটিকে সর্বদা হকের উপর পরিচালিত করবেন। এ থেকে স্পষ্ট, আহলুস সুন্নাহর বহির্ভূত – যেমন, রাফেজি, খারেজী, মু'তাজেলী, মুরজিয়া ইত্যাদি - বিদআতি ফেরকা তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না। এ হিসেবেই সালাফের অনেকে বলেছেন, তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে- আহলে ইলম, আহলুস সুন্নাহ ও মুহাদ্দিসিনে কেরাম। যেমন,

ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

هم أهل العلم. اهـ

"তারা হচ্ছেন আহলে ইলমগণ।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. اهـ

"তারা যদি মুহাদ্দিসগণ না হয়ে থাকেন, তাহলে আমার বুঝে আসে না যে, আর কারা হবে।"

কাযি ইয়াজ রহ. বলেন,

إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. اهـ
"ইমাম আহমাদের উদ্দেশ্য, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ এবং মুহাদ্দিসগণের মত-পথের বিশ্বাসীরা।"

[দেখুন, বদরুদ্দীন আইনী রহ. কৃত সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ: উমদাতুল ক্বারী; ১৩/৬৬]

ইমাম আহামদ রহ. এর যামানায় হাদিস বিশারদ মুহাদ্দিসগণই ছিলেন আহলুস সুন্নাহর প্রতীক। তাই মুহাদ্দিসগণ দ্বারা তার উদ্দেশ্য, আহলুস সুন্নাহ- যেমনটা কাযি ইয়াজ রহ. বলেছেন।

সালাফের এসব বক্তব্যে আহলে ইলম ও মুহাদ্দিসগণ তথা আহলুস সুন্নাহকে তায়েফায়ে মানসূরা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য, তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন বিদআতি ফিরকা তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। সামনে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

তিন.
জিহাদ ব্যতীত তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়

তায়েফায়ে মানসূরার একান্ত বিশিষ্ট যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তা হল, তারা কিতাল করতে থাকবে এবং তাদের দুশমনদেরকে বিভিন্নভাবে পর্যদুস্ত করতে থাকবে। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এ বিশেষ গুণটি – তথা কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল – ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া সম্ভব নয়। তায়েফায়ে মানসূরা হতে হলে অবশ্যই কিতালে জড়িত হতে হবে। ইলম ছাড়া যেমন আলেম হওয়া যায় না, হাদিস ছাড়া মুহাদ্দিস হওয়া যায় না, তাফসীর ছাড়া মুফাসসির হওয়া যায় না, ফিকহ ছাড়া ফকিহ হওয়া যায় না- তদ্রূপ কিতাল ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যায় না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

فالتحقيق أن المراد بالطائفة الجماعة المجاهدة. اهـ

“তাহকিকি ও বাস্তবসম্মত কথা হচ্ছে, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা মুজাহিদ জামাত উদ্দেশ্য।” – মিরকাত: ১১/৪৪১

বি.দ্র.

আমি আগেও বলেছি, তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে,

আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত। এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ধরুন, জিহাদ যখন ফরযে কেফায়া থাকবে, তখন জিহাদে না যাওয়ার সুযোগ আছে। আহলুস সুন্নাহর মধ্যে যারা তখন জিহাদে যাবে, তারা তায়েফায়ে মানসূরা। তারা যাবে না, তারা তায়েফায়ে মানসূরা নয়; কিন্তু আহলুস সুন্নাহ। অতএব, ক্ষেত্র বিশেষে তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। কাজেই, লক্ষ রাখবো, দু'টোর মাঝে গরমিল যেন না করে ফেলি। এমন অভিযোগ যেন কেউ না করে যে, মুজাহিদগণ বাকি সকলকে আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত দাবি করে। তবে আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কার হওয়ার মতো কোন আকীদা পাওয়া গেলে তখন ভিন্ন কথা। তখন সে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত। তবে জিহাদে না যাওয়ার কারণে নয়, বিদআতি আকীদার কারণে। তদ্রূপ, জিহাদ যখন ফরযে আইন থাকে, তখন জিহাদে না গেলে এবং তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হলে গোনাহগার হবে।

** ইমাম আহমাদ রহ. এর বক্তব্য এবং একটি বিভ্রান্তির নিরসন

আমরা দেখেছি, তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর একটা দল। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নয়। হাদিস থেকে বিষয়টা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু সালাফের কারো কারো বক্তব্য থেকে কেউ কেউ বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। যেমন, একটু আগেই ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম বুখারী রহ. এবং কাযি ইয়াজ রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। বাহ্যত তাদের কথার সারমর্ম, আহলুস সুন্নাহ কিংবা আহলুস সুন্নাহর আহলে ইলম ও মুহাদ্দিসগণ হচ্ছেন তায়েফায়ে মানসূরা। বাহ্যত তাদের কথা থেকে বুঝা যায়, তায়েফায়ে মানসূরা হওয়ার জন্য জিহাদ শর্ত নয়। কিন্তু পাঠক মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন, এ কথা হাদিসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তায়েফায়ে মানসূরার জন্য জিহাদ শর্তের কথাটা হাদিসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এসেছে। ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারীর মতো ব্যক্তিদের কাছে বিষয়টা অজানা নয়। এমন সুস্পষ্ট হাদিস থাকার পরও তারা কিছুতেই বলতে পারেন না যে, জিহাদ ছাড়াও তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যাবে। বরং তাদের কথা উদ্দেশ্য – যেমনটা একটু আগেও উল্লেখ করা হয়েছে – তায়েফায়ে মানসূরা আহলে ইলম ও আহলুস সুন্নাহ থেকে হবে। কোন বিদআতি ফিরকা তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না। তাদের কথার এ অর্থ করলে তখন হাদিসের সাথে আর কোন বিরোধ থাকে না।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,

واختلف في تعيين مصداقِهِ وكلٌّ ادّعى بما بدا له. قلت: كيف مع أنه منصوصٌ في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري من هي؟ ولم أكن أفهم مراده لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه الغفلة لمثل أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده: وهو أن المجاهدين ليسوا إلا من أهل السنة، فعلمت أنه عيَّنَهم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائِدِهم، ويشهد له التاريخ فإنه لم يُوفَّق للجهاد أحد غيرُ تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على أيدي الرو افض خذلهم الله ولعنهم. اهـ

"তায়েফায়ে মানসূরা কারা এ নিয়ে মতভেদ আছে। প্রত্যেকে নিজের বুঝ অনুযায়ী একেকটাকে তায়েফায়ে মানসূরা দাবি করেছে। (আশ্চর্য যে,) কিভাবে এখানে মতভেদ করা সম্ভব, অথচ হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, তারা হচ্ছেন আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ?! ইমাম আহমাদ রহ. থেকে দেখেছি যে, তিনি বলেছেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ যদি ঐ তায়েফা না হয়, তাহলে আমার বুঝে আসে না যে, আর কারা হবে'! আমি আহমাদ রহ. এর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলাম না। কারণ, আপনি দেখেছেন, হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য, তারা হচ্ছেন মুজাহিদগণ। আহমাদ রহ. এর মতো ব্যক্তির কাছে বিষয়টা অজানা থাকতে পারে না। এরপরও তিনি কিভাবে বলতে পারেন, সে তায়েফা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ?! পরে আমার আহমাদ রহ. এর উদ্দেশ্য বুঝে আসলো। তা হলো, মুজাহিদগণ কেবল আহলুস সুন্নাহর মধ্য থেকেই হয়ে থাকেন। কাজেই, আপনি বুঝতে পারছেন, তিনি আহলুস সুন্নাহকে তায়েফায়ে মানসূরা বলেছেন, তাদের জিহাদের দিকটি বিবেচনা করে; (শুধুমাত্র) আকীদার দিকে লক্ষ করে নয়। আর ইতিহাসও এর সাক্ষ্যি। আহলুস সুন্নাহ ছাড়া আর কারো জিহাদের তাওফিক হয়নি। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ইসলামী সালতানাত তো রাফেজীদের হাতেই ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তাদের অপদস্ত ও অভিশপ্ত করুন।" – ফায়জুল বারী; ১/১৭১, কিতাবুল

ইলম, বাব: মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ..., ছাপা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেউবন্দ

চার.
তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামে সীমাবদ্ধ নয়

তায়েফায়ে মানসূরার ব্যাপারে বর্ণিত সহীহ হাদিসসমূহে 'তায়েফায়ে মানসূরা কোন ভূখণ্ডে থাকবে'- এমন কোন সুনির্দিষ্ট নাম আসেনি। এ থেকে স্পষ্ট যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন হকপন্থী মুজাহিদ জামাতই তায়েফায়ে মানসূরা। তবে কোনো কোনো হাদিসে এসেছে যে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাস এবং তার আশেপাশের এলাকায় তথা শামে থাকবে।

যেমন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বর্ণনায় এসেছে,

لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم الا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. [تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره دون قوله : " قالوا : يا رسول الله وأين هم ...إلخ " وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي

"আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, (অনেক সময়) তারা কষ্ট ও সংকীর্ণতার শিকার হবে। আল্লাহ তাআলার ফায়সাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু'মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্তই তাদের এ ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, বাইতুল মাকদিস ও বাইতুল মাকদিসের আশেপাশে।" – মুসনাদে আহমাদ; হাদিস নং ২২৩৭

এ হাদিস এবং এ জাতীয় আরো কিছু হাদিস, যেগুলোতে বাইতুল মুকাদ্দাস ও শামের কথা এসেছে, সেগুলো যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে এর উদ্দেশ্য: বাইতুল মুকাদ্দাস ও পূণ্যভূমি শামের সাথে তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ সম্পৃক্ততা

থাকবে এবং সেখানে সর্বদাই তায়েফায়ে মানসূরার একটা জামাত থাকবে। অন্যান্য ভূখণ্ডে তায়েফায়ে মানসূরার কোন জামাত না থাকলেও শামে একটা জামাত থাকবে। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তায়েফায়ে মানসূরা কেবল শামেই থাকবে আর কোথাও থাকবে না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

قيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قلت: فيه بحث فإن أهل المغرب أيضا من الأروام وغيرهم يحاربون الكفار ; أيدهم الله تعالى. فالتحقيق أن المراد بالطائفة الجماعة المجاهدة لا على التعيين، فإن فيما وراء النهر أيضا طائفة يقاتلون الكفرة قواهم الله تعالى، وجزى المجاهدين عنا خيرا حيث قاموا بفرض الكفاية وأعطوا التوفيق والعناية. اهـ

"কেউ কেউ বলেন, তায়েফায়ে মানসূরা হল শাম এবং তৎপরবর্তী এলাকার অধিবাসীগণ। তবে আমি বলি, এতে আপত্তি আছে। কেননা, মাগরিবের রোম ও অন্যান্য এলাকার অধিবাসীগণও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের নুসরত করুন। তাই, তাহকিকি ও বাস্তবসম্মত কথা হল, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা মুজাহিদ জামাত উদ্দেশ্য; তবে (সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের) সুনির্দিষ্ট কোন জামাত নয়। কেননা, মাওয়ারাউন নহরেও একটা দল আছে, যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে। আল্লাহ তাআলা তাদের শক্তিশালী করুন। তারা ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব আদায় করছেন। আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তাওফিক ও কৃপা লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে মুজাহিদগণকে উত্তম বিনিময় দান করুন।" – মিরকাত: ১১/৪৪১

অতএব, এ কথা বলা যায়, শামে তায়েফায়ে মানসূরার একটা জামাত সব সময় থাকবে। পাশাপাশি অন্যান্য ভূখণ্ডেও থাকতে পারে। তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামেই সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবতাও এর সাক্ষ্য। শামের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, শামে সব সময়ই কোনো না কোনো জামাত জিহাদে লিপ্ত ছিল। বাইতুল মুকাদ্দাস যখন ক্রুসেডারদের দখলে ছিল, তখনও শামে জিহাদ চলমান ছিল। পাশাপাশি অন্যান্য অনেক ভূখণ্ডেও আমরা দেখছি যে, আলহামদু লিল্লাহ, জিহাদ চলে আসছিল এবং এখনও চলছে।

পাঁচ.

তায়েফায়ে মানসূরার জিহাদের বরকতেই দ্বীন টিকে আছে

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত উল্লিখিত হাদিসগুলোর ২ নং হাদিসটি ছিল,

«لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ».

“এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২

এ হাদিসের দু’টি অংশ;

ক. **لن يبرح هذا الدين قائما** ‘এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে’।

খ. **يقاتل عليه عصابة من المسلمين** ‘মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে’।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশের কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ এ দ্বীন এ কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, মুসলমানদের একটা জামাত সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। তাদের কিতালের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা এ দ্বীন টিকিয়ে রাখবেন।

আরেকটু স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, যখন বলা হল, ‘এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে’ তখন যেন একটা প্রশ্নের উদ্রেগ হল যে, এ দ্বীন কেন প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এ প্রশ্নের *উত্তরে দ্বিতীয় বাক্যটি বলা হল। অর্থাৎ এ দ্বীন টিকে থাকার কারণ হচ্ছে, মুসলমানদের একটা জামাত সর্বদাই দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে। তাদের কিতালের বদৌলতেই দ্বীন টিকে থাকবে।

আল্লামা তিবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

((يقاتل عليه)) جملة مستأنفة بيانا للجملة الأولي ... أي يظاهرون بالمقاتلة علي أعداء الدين، يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة. اهـ

“ ... ‘কিতাল করতে থাকবে’ বাক্যটি একটি নতুন বাক্য, যা প্রথম বাক্যটির (তথা তা থেকে সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তরের) বিবরণ দিচ্ছে। ... উদ্দেশ্য, এই তায়েফার কিতালের বদৌলতে এ দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৩২

এখানে **ইমাম জাসসাস রহ.** এর সেই অবিস্মরণীয় কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেখানে তিনি জিহাদের বাস্তবতাটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وليس بعد الإيمان بالله ورسوله فرض آكد ولا أولى بالإيجاب من الجهاد، وذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار الإسلام وأداء الفرائض، وفي ترك الجهاد غلبة العدو ودروس الدين، وذهاب الإسلام. اهـ

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক কোন ফরজ নেই। তা এ কারণে যে, জিহাদের দ্বারাই ইসলামের বিজয় এবং ফারায়েযগুলো আদায় করা সম্ভব। আর জিহাদ ছেড়ে দিলেই শত্রু বিজয়ী হয়ে যাবে, দ্বীন মিটে যাবে এবং ইসলাম নিঃশেষ হয়ে যাবে।” - আহকামুল কুরআন; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৯

আজ যারা নির্বিঘ্নে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন, মাদ্রাসায় নিরাপদে দরস দিতে পারছেন, মসজিদে নিশ্চিন্তে রবের ইবাদত করতে পারছেন, আর দাবি করছেন- এগুলো তাদের নেক আমলের ফসল: তাদের উচিৎ এ হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করা। একটু ভাবা উচিৎ, আসলে কি এগুলো শুধু তাদের নেক আমলেরই ফসল, না’কি মুজাহিদিনে কেরামের কুরবানী আর শহীদানের রক্তের বরকত।

***

সারকথা:

- তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর মধ্য থেকে হবে; বিদআতিদের মধ্য থেকে হবে না। ইমাম আহমাদ রহ. সহ আরো যাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ- এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

- তারা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকবে।

- তারা একটি জিহাদি জামাত হবে। যারা জিহাদে জড়িত হবে না, তারা আহলুস সুন্নাহ হওয়া সম্ভব হলেও তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না।
- তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ভূখণ্ডের হকপন্থী জিহাদি জামাতগুলোও তায়েফায়ে মানসূরার অংশ।

- তায়েফায়ে মানসূরা সর্বদাই বিদ্যমান থাকবে। কোন যামানাই তায়েফায়ে মানসূরা শূন্য হবে না। এক ভূখণ্ডে না থাকলে অন্য ভূখণ্ডে থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে মিলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিতাল করা পর্যন্তই তারা কিতাল করে যেতে থাকবে।

- তাদের জিহাদের বদৌলতে এ দ্বীন টিকে থাকবে।

- তায়েফায়ে মানসূরা সর্বদা বিদ্যমান থাকাটা এ বিষয়ের একটা দলীল যে, খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম গড়ে তোলা এবং তাতে যোগ দেয়া যাবে। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে খেলাফত না থাকাবস্থায় যেসকল দল পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে, তার দ্বারা না-হক্ব দল উদ্দেশ্য। আহলুস সুন্নাহর অনুসারি হক দল উদ্দেশ্য নয়।

والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৮৮

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও অন্যান্য

সত্যের খুজে

Senior Member

১২-২২-২০১৮

এক ভাইয়ের ফেসবুক টাইমলাইন থেকে নেয়া । সবাই কস্ট হলেও পড়বেন । গণতন্ত্র, নির্বাচন ও অন্যান্য

স্ট্র-ম্যান আর্গুমেন্ট (Straw man) বলে একটা জিনিস আছে। আপনি আপনার প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সবচেয়ে ফালতু, সবচেয়ে দুর্বল একটা ভারশান বানাবেন। সেটাকেই তার বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরবেন এবং তারপর ইচ্ছেমতো আপনার বানানো সেই ভুলভাল ভারশানের খন্ডন করবেন। ফেইসবুক এবং ইন জেনারেল ইন্টারনেট তর্কবিতর্কে (সাধারণ বিতর্কেও) রেড হেরিং, অ্যাড হমিনেম এবং স্ট্র-ম্যান আর্গুমেন্টের ব্যবহার খুব বেশি। কারণও আছে। এসব করে আসলে তেমন কিছু না বলেই অনেক কিছু বলার ভান করা যায়। প্রতিপক্ষের যুক্তি খন্ডন না করেই খন্ডন করার দাবি করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা জোড়াতালি দিয়ে একরকম তর্কে জেতা যায়। স্ট্র-ম্যান আর্গুমেন্টের উল্টোটাও আছে। স্টিল-ম্যান আর্গুমেন্ট (Steel Man)। আপনি প্রতিপক্ষের আলোচনার সবচেয়ে শক্তিশালী ভারশানকে নেবেন, সেটাকে উপস্থাপন করবেন (সম্ভব হলে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কনফার্ম হয়ে নেবেন আপনি কি ঠিকঠাক তার অবস্থানকে তুলে ধরতে পেরেছেন কি না, নাকি কোন ভুল হয়েছে) এবং তারপর সেটার খন্ডন করবেন। এটার প্রচলন বাংলাদেশে এবং বাংলা ফেইসবুকে মোটামুটি নেই বললেই চলে।

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কও অনেকটা এভাবেই চলছে। কিন্তু যদি আমরা আসলে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে কোন গঠনমূলক অবস্থানে পৌছাতে চাই তাহলে আমাদের উচিৎ স্ট্র-ম্যান বাদ দিয়ে স্টিল-ম্যান আর্গুমেন্ট নিয়ে আগানো। কারণ এভাবে নিজের অবস্থানকে তো ভালোভাবে বুঝতে হবেই সেই সাথে প্রতিপক্ষের অবস্থান ও কোন মাইন্ডসেট থেকে তিনি নিজ উপসংহারে

পৌছাচ্ছেন সেটাও বোঝা যাবে। এটা করা গেলে অনেকে ক্ষেত্রেই তিক্ততা সম্ভবত এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে এই তর্কে ইসলামপন্থীদের মধ্যে মোটাদাগে তিন ধরনের অবস্থান দেখা যায়।

১) যারা গণতন্ত্রকে সম্পূর্নভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। গণতন্ত্রকে শিরক ও কুফরি মনে করেন। প্রায় কোন অবস্থাতেই নির্বাচন করা অথবা ভোট দেয়াকে জায়েজ মনে করেন না।

২) যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে উম্মাহর উত্তরন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা নির্বাচন করা ও ভোট দেয়াকে দায়িত্ব ও ইবাদত মনে করেন।

৩) যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন (অনেকে শর্তসাপেক্ষে মনে করেন)। এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করেন না, তবে বর্তমাণ পরিস্থিতিতে নিরুপায় ও অপারগতার বলে চিহ্নিত করে একরকম বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেয়াকে জায়েজ বলেন।

এখন যে তর্কটা হচ্ছে সেটা ১ ও ৩ নং দলের মধ্যে। এখানে ১ নং অবস্থানের জায়গা থেকে আমি ৩ নং অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার এবং তাদের মূল প্রশ্নগুলোর (বা দাবিও বলা যায়) জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো। যেহেতু ৩ নং অবস্থানের জায়গা থেকে মোর অর লেস মেনে নেয়া হয় যে গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ, এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম সম্ভব না, তাই এই আলোচনায় ২ নং অবস্থান সম্পর্কে কিছু আনা হবে না। এবং গণতন্ত্র কুফরি ও শিরক হবার ব্যাপারে আলোচনা আনা হবে না।

এখানে কন্ডেনসড ভাবে কিছু পয়েন্ট শুধু এসেছে। সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা আনা হয়নি। ব্যাখ্যা করা হয়নি। এসব ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে অনেক পাঠকের ভুল বোঝার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, কিন্তু সময় ও লেখার আকারের দিকে তাকিয়ে এভাবেই লিখতে হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও লেখা ৭৫০০+ শব্দের হয়ে গেছে। এই লেখা কোন অর্থেই পূর্ণাংগ

আলোচনা না, বরং অসম্পূর্ণ। কেউ চাইলে এগুলোর ওপর আরো বিল্ড করতে পারেন, এগুলো থেকে আলোচনা আরো বিভিন্ন দিকে নেয়া সম্ভব।

এই লেখার কোন স্বত্ব নেই, যে কেউ ইচ্ছে মতো শেয়ার, ডাউনলোড, প্রচার কিংবা উদ্ধৃতি দিতে পারেন কোন ধরনের ক্রেডিট দেয়া ছাড়াই, তাই এব্যাপারে প্রশ্ন করার দরকার নেই। এক বসায় লেখা হয়েছে, ডাবল চেক করা হয়নি। তাই প্রচুর বানান ভুল থাকার কথা। উপেক্ষা করতে হবে। লেখার অনেক অংশই 'ভুল প্রশ্নের ভুল জবাব' বই (প্রকাশিতব্য) থেকে প্যারাফ্রেইয বা সরাসরি উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এটার পরিমাণ এতোটাই বেশি যে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হলনা।

লম্বা কিন্তু দরকারী এ ভূমিকার পর মূল আলোচনায় যাওয়া যাক।

মূল বক্তব্য

যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন (অনেকে শর্তসাপেক্ষে মনে করেন)। এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করেন না, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরুপায় ও অপারগতার বলে চিহ্নিত করে একরকম বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেয়াকে জায়েজ বলেন – তাদের মূল দাবিগুলো কী? কোন যুক্তিতে বা কীসের ভিত্তিতে তারা ভোট দেয়া বা নির্বাচনে অংশগ্রহণকে শর্তসাপেক্ষে জায়েজ বলছেন?

এক্ষেত্রে দুটি পয়েন্ট আমরা মাসিক আল-কাউসারের 'নির্বাচন ও ভোট : ইসলামী দৃষ্টিকোণ' (মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যা) লেখা থেকে নিতে পারি।

একটি হল, নিরুপায় হওয়া, অপারগতা, পরিস্থিতির দাবি ইত্যাদি। যেমন মাসিক আল-কাউসারের এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, '...এই গণতন্ত্রই হয়ে গেছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তা যেন ঈমান-আকীদার মতো অপরিহার্য এবং এর যেন কোনো বিকল্প নেই।'

'...সুতরাং এ ব্যবস্থায় যে শান্তি বা কল্যাণের আশা করা যায় না এবং এ পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান লোকজনের সরকার গঠিত হওয়া যে অনেকটা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তবুও পশ্চিমা গণতন্ত্র ও নির্বাচনই

বর্তমানে আমাদের কাছে তিক্ত বাস্তবতা। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা এখন সে পদ্ধতির অনুসারী।'

দ্বিতীয়টি হল, মন্দের ভালো এবং তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেয়া। যেমন এই লেখার শেষে 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে' শিরোনামের নিচে বলা হয়েছে "...মন্দের ভালো বা তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেওয়া এবং অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। বর্তমানে ভোটকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনায় আনতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কোনো আসনে একজন লোককেও যদি সাক্ষ্য ও ভোট দেওয়ার উপযুক্ত মনে না হয় তবে তাদের মধ্যে যে জন নীতি-নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা ও কাজে-কর্মে অন্য প্রার্থীর তুলনায় কম খারাপ তাকেই ভোট দিতে হবে। কারো ব্যাপারে যদি খোদাদ্রোহিতা, ইসলাম-দুশমনী, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ-বিরোধী হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত থাকে তবে ঐ অসৎ ব্যক্তির বিজয় ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে ভোটারাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে।"

এবং

"...মোটকথা, গণতন্ত্র ও বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির যতই ত্রুটি থাকুক এর কারণে ভোট দানে বিরত থাকা সমীচীন হবে না; বরং বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ করে, ভেবে-চিন্তে ভোটারাধিকার প্রয়োগ করতে হবে ভাল-মন্দের ভালো অথবা অন্তত কম মন্দের পক্ষে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে কাউকে ভোটদানের অর্থ হবে, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, লোকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের তুলনায় কিছুটা হলেও ভালো।"

তৃতীয় একটি পয়েন্ট এসেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর একজন নেতার বক্তব্য থেকে যেখানে তিনি বলেছেন, নির্বাচন আর গণতন্ত্র এক না। গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ। কিন্তু নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র না। এই বক্তব্যটি 'চরমোনাই টিভি' নামের একটি মিডিয়ার প্রকাশিত ভিডিও থেকে নেয়া, ভিডিওর লিঙ্কটি আমি এ মূহুর্তে খুঁজে পাচ্ছি না, কেউ পেলে দয়া করে জানাবেন। এই দলটি ছাড়াও এই ধারা অনুসারী আরো অনেকে এই মতটি গ্রহণ করে থাকেন।

এর বাইরে ফেইসবুকে চলা আলোচনা থেকে আরো একটি পয়েন্ট বারবার উঠে এসেছে, সেটা হল 'বাধ্য হয়ে ভোট দেয়ার এই পদ্ধতি যদি বর্জন করা হয়, তাহলে বিকল্প কী হবে?'

তাহলে আমরা মোট চারটি প্রশ্ন বা দাবি দেখতে পাচ্ছি।

১) জরুরত (নিরুপায় হওয়া, অপারগতা, পরিস্থিতির দাবি ইত্যাদি)

২) মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেয়ার নীতির প্রয়োগ

৩) নির্বাচন ও গণতন্ত্র এক না। নির্বাচন ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতিমাত্র

৪) বিকল্প কী?

এখানে সংক্ষেপে হলেও গণতন্ত্রের বিরোধিতাকারীদের মূল অবস্থান বলে নেয়া দরকার। যারা গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যানের কথা বলেন তারা বিশ্বাস করেন,

গণতন্ত্র কুফর ও শিরক

গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্*র আইনের শাসনের বদলে মানুষের আইনে শাসন হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ্*র আইনকে বাতিল করা হয় না বরং গায়রুল্লাহর আইনের অনুসরণকে আবশ্যিক/বাধ্যতামূলক করা হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্*র দ্বীনের শাসনকে অস্বীকার করা হয় এবং জনগণের সার্বভৌম মতের শাসনকে আবশ্যিক (অ্যাটলিস্ট ইন থিওরি) করা হয়

গণতন্ত্র একইসাথে পশ্চিমা সেক্যুলার আদর্শনের অংশ এবং বাহন

গণতন্ত্রকে পূর্নাঙ্গভাবে দেখলে এটাই সবচেয়ে অ্যাকুরেট এবং প্রিসাইস কথা হল গণতন্ত্র একটি পৃথক জীবনব্যবস্থা এবং দ্বীন (democracy in its totality is a separate deen)

বর্তমান সময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকগুলোর একটি হল গণতন্ত্র। গণতন্ত্র যদি হুবাল নাও হয়, নিশ্চিতভাবেই লাত-মানাত-উযযার একটা।

এছাড়াও আর অনেক আপত্তি যুক্ত করা যায়, তবে গণতন্ত্রের প্রশ্নে এই অবস্থানের আপত্তির সবচেয়ে গুরুতর কারণগুলো এখানে দেয়া হল। মূলত নির্বাচন ও ভোটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান আসে গণতন্ত্রের ব্যাপারে এই ধারণা থেকে। তবে এসব কিছু সত্ত্বেও এই মতের অনেকেও কিছু শর্তসাপেক্ষে মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম ক্ষতি গ্রহনের নীতির আলোকে ভোট দেয়াকে অত্যন্ত সীমিত কিছু ক্ষেত্রে জায়েজ বলেন। যেমন শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল উলওয়ান

হাফিযাহুল্লাহ এর মতে জার্মানি কিংবা ডেনমার্কের মতো দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে বসবাস করা মুসলিমরা এমন ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারে যেখানে একজন প্রার্থী চরমভাবে ইসলামবিদ্বেষী এবং অন্যজন অতোটা না। এই ব্যাপারে শায়খের একটা অডিও রেকর্ডীং ইউটিউবে ছিল এখন খুঁজে পাচ্ছি না। পেলে লিঙ্ক যুক্ত করে দেয়া হবে ইন শা আল্লাহ্*। এমন ক্ষেত্রে দুই প্রার্থীর অবস্থানে সিগনিফিক্যান্ট পার্থক্য থাকতে হবে, মুসলিমদের সত্যিকারভাবেই আর কোন উপায় না থাকতে হবে, এরকম বেশ কিছু শর্ত তিনি দিয়েছেন এবং তিনি এটি কাফিরদের দেশে মাইনরিটি হিসেবে বসবাস করা মুসলিমদের ক্ষেত্রে বলেছেন। কাজেই এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে মাসিক আল-কাউসারের বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যেখানে প্রার্থীদের মধ্যে মাত্রার তেমন গুরুতর কোন পার্থক্য নেই সেখানে 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে' বলা আর শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল-উলওয়ান এর মত এক না। এবং তাঁর মত অ্যামেরিকা ও ইউরোপে ডেমোক্রেট পার্টি কিংবা অন্যান্য লেফটিস্ট দলগুলোর সাথে কৌশলগত ঐক্য করা ও ক্যাম্পেইন করা মুসলিম সংগঠন ও সেলিব্রিটি আলিমদের মতোও না।

গণতন্ত্র একটি কুফরি ও শিরকি মতবাদ হওয়া, এর মাধ্যমে ইসলাম কায়েম সম্ভব না হওয়া এবং এটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা হওয়া নিয়ে দালীলিক যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক প্রমান নিয়ে সালাফি, আহলে হাদিস, দেওবন্দি এমনকি বেরেলভি মাসলাকের অনেকেই আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেগুলো দেখে নিতে পারেন। যেহেতু এ লেখার উদ্দেশ্য উক্ত অবস্থানের যৌক্তিকতা তুলে ধরা না তাই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া হল না।

আমরা এখন একে একে ওপরে আসা এই চারটি দাবি বা প্রশ্নের ব্যাপারে একে একে আলোচনায় যাবো (এই লেখাকে কোন আলিম, প্রতিষ্ঠান, বা ফতোয়ার খন্ডন বা এই জাতীয় কিছু মনে করা উচিৎ না। সেটা আলিমরাই করবেন ইন শা আল্লাহ্*। এই বক্তব্যগুলোর আলোকে যেসব রেটোরিকাল এবং লজিকাল প্রশ্ন/দাবি তোলা হয় সেগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা মনে করা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় আলোচ্য বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু চিন্তা শেয়ার করা মনে করলে।) –

জরুরত

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে অপারগতার দোহাই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় যে - ভোট দেয়া ছাড়া অবস্থা পরিবর্তনের আর কোন উপায় নেই। নির্বাচন ও ভোট এখন বাস্তবতা, এই ময়দানও যদি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। আমরা ভোট না দিলেও নির্বাচন তো হবে। তাই বাধ্য হয়েই,অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের এখানে অংশগ্রহণ করতে হবে। সেটা জরুরুত, ওজর, রুখসত যেটার ভিত্তিতেই হোক না কেন।

এই দাবিগুলোর ভিত্তিতে আমাদের কিছু দিক নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

১) জরুরতের এ দর্শন নেয়া হয়েছে শরীয়তের প্রসিদ্ধ মূলনীতি (**الضرورات تبيح المحظورات**) 'প্রয়োজনের সময় হারাম বস্তুও হালাল হয়ে যায়' থেকে। প্রথমত, এটা বোঝা জরুরী যে ফিকহের এই মূলনীতি (প্রয়োজনের সময় হারামও হালাল হয়ে যায়) অনুযায়ী প্রয়োজনের সময় কোন জিনিসকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়া ঐ জিনিষের মৌলিকভাবে হারাম হওয়াকে প্রমাণ করে। অর্থাৎ এই মূলনীতির ভিত্তিতে যখন কোন জিনিসকে একান্ত প্রয়োজনের কারণে হালাল বলা হয় তখন স্বত্তাগতভাবে সেটা হারামই থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন কিংবা ভোট দেয়াকে 'জরুরতের' দর্শনের ভিত্তিতে হালাল স্বীকৃতি দিলে এটাও মেনে নিতে হবে যে স্বত্তাগতভাবে সেটা হারাম। (এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে যারা গণতন্ত্রকে কুফর ও শিরক মনে করেন তারা পার্লামেন্টারি ইলেকশনে ভোট দেয়াকে নিছক হারাম মনে করেন না। তাদের অবস্থান অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে এটা কুফর পর্যন্ত যেতে পারে। আর সংসদ নির্বাচন করা তাঁরা মূলত কুফর মনে করেন এবং মনে করেন যে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এটা কুফরের চেয়ে কম হতে পারে। সুতরাং এই অবস্থান অনুযায়ী এই পুরো আলোচনা শেষ পর্যন্ত অতোটা গুরুত্বপূর্ন না। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আপাতত তর্কের খাতিরে হারাম ধরে নিয়েই এগোবো।)

কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোট দেয়াকে হারাম বলে জানে? এই কাজগুলো যে হারাম সেটা জনগণকে জানানোর যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে? ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? এটা সত্য যে অল্প হলেও গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করা মানুষের সংখ্যা এখন কিছুর শ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে

বাড়ছে। কিন্তু এটা কাঁদের দাওয়াহর কারণে? যারা গণতন্ত্রকে কুফরি ও শিরক মনে করেন তাদের দাওয়াহর কারণে এটা হচ্ছে । 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে' এটা যতোটুকু জোরের সাথে বলা হচ্ছে, ভোট দেয়া ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ যে হারাম সেটা কি একই রকম জোর দিয়ে বলা হচ্ছে? মসজিদের মিম্বারে, ওয়াজ-মাহফিলে, পত্রিকা কিংবা অন্য কোথাও? এভাবে আংশিক বলা, মুখ্য অংশকে গোপন করে গৌন অংশকে প্রচার করা কি একদম কমে নৈতিক ও আদর্শিক ইনকনসিস্টেন্সি না?

২) একইসাথে আমরা এটাও দেখি যে অনেক ইসলামী রাজনৈতিক দল একদিকে নির্বাচনকে জিহাদ বলে দাবি করেন, কিংবা 'অমুক মার্কায় ভোট দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভোট দেয়া হবে' বলে দাবি করেন, আবার অন্যদিকে একে বৈধ প্রমানের সময় জরুরতের কথা বলেন। এভাবে জরুরতের অজুহাতে দেয়া স্ববিরোধীতা ছাড়া আর কী হতে পারে? একদিকে এটা ইসলামের শিখর জিহাদ, নবীওয়ালা কাজ (যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোট পাবেন!! ইয়াযুবিল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ্* ও তাঁর রাসূল এসব থেকে পবিত্র), অন্যদিকে এটা জরুরতের কারণে বৈধ?

যদি এ কাজগুলো স্বত্তাগতভাবেই জায়েয হয়, কিংবা আরো একটু আগে বেড়ে ইবাদত হয়, অথবা 'আমানত' হয়, অথবা শার'ঈ দায়িত্ব হয় তাহলে 'জরুরত' এর দাবি বলার প্রয়োজন কী? আর যদি সত্যিই তা জরুরতের ভিত্তিতে বৈধ হয় 'আমানত', 'শার'ঈ দায়িত্ব' (কিংবা 'জিহাদ') এসব বলার মানে কী? বরং এটাকে হারাম নির্বাচন বা হারাম ভোট বলা যেতে পারে, যাতে মানুষ ভোট দিলেও অন্তত এটুকু বুঝে যে এই কাজ সত্ত্বাগতভাবে না, বরং একান্ত প্রয়োজনের কারণে বৈধ। এবং সাধারণ মানুষ যেন একে খারাপ মনে করে এর সাথে শুধু অতোটুকুই যুক্ত হয় যতোটুকু না করলেই না। এভাবে অ্যাটলিস্ট মানুষ বুঝবে এই কাজটা হারাম, এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

৩) যদি ধরে নেয়া হয় যে, ভোট ও নির্বাচন আসলেই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে তাহলে জরুরত বা একান্ত প্রয়োজনের সীমা ও সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে ঠিক করা দরকার। দিনশেষে আল্লাহ্*র আইনের বদলে অন্যের আইন দ্বারা শাসন, আল্লাহ্*র আইনকে অকার্যকর করা, মানুষকে আইন প্রণেতা হিসেবে গ্রহণ করা,

গায়রুল্লাহর আইন মানতে বাধ্য করা এগুলো ছোটখাটো কোন বিষয় না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জরুরতে হোক কিংবা গা বাচানোর কারণে হোক নির্বাচনে দাড়ানোর মাধ্যমে ও ভোট দেয়ার মাধ্যমে মানুষ এই ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ায় অংশ হচ্ছে। যদি এই ধরনের কাজকে আমরা আবারো তর্কের খাতিরে হারাম ধরি তাহলেও এমন গুরুতর হারাম কাজকে বৈধ বানানোর জন্য জরুরতের পরিমাণও মারাত্মক পর্যায়ের হতে হবে (তবে এই কাজ মূলত কুফর ও শিরক। জরুরতের কারণে কুফর ও শিরক জায়েজ হয় কি না তা নিয়ে আলোচনা পড়ে আসবে)। এমন হারাম কোন মাত্রার প্রয়োজনের সময়ে বৈধ হতে পারে ফুকাহায়ে কেরাম সেটা নির্ধারণ করে গেছেন। সেটা হল, 'প্রাণ অথবা অঙ্গহানির আশঙ্কা' (loss of life & limb)। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ভোটারের সংখ্যা ১০ কোটি ৩০ লাখ[১]। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০%। এই ১০ কোটি মানুষ কি প্রান অথবা অঙ্গহানির আশংকায় আছেন যে 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে'? আর যদি সত্যিই এমন হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে দেশের ৬০% এর বেশি মানুষের প্রাণ কিংবা অঙ্গহানির আশঙ্কা তৈরি করা সরকারকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ওলামায়ে কেরাম আনুগত্য পাবার অধিকারী দাবি করতে পারেন? আর কিভাবেই তা তাদের জন্য দোয়া করতে পারেন? আর তাদের সাথে এক মঞ্চে বসে প্রশংসায় ভাসাতে পারেন? অথবা এ নিয়ে নিরব থাকতে পারেন?

বাস্তবতা হল ভোট আর নির্বাচনের সাথে অধিকাংশ মানুষের জীবননাশ কিংবা প্রানহানির আশঙ্কা জড়িত নেই। সেক্ষেত্রে এই মূলনীতির আলোকে ঢালাওভাবে বৈধতা দেয়া, ভোট দিতেই হবে এমন বলা কিভাবে শুদ্ধ হয়?

৪) 'জরুরত' এর ভিত্তিতে কোন কিছুকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বৈধতার পরিমাণ বা সীমা ঠিক করা'। ফিকহের মূলনীতি হল, প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ বস্তু অতোটুকুই বৈধ হবে যতোটুকু প্রয়োজন। যা বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে বৈধ সেটাকেই মূল চাহিদা কিংবা ন্যায্য মনে করে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যাবে না। জীবন বাঁচানোর জন্য শুকরের গোশত খাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু তার মানে এটা না যে সেই গোশতের টিক্কা, কাবাব, বার্গার, আর সাব-স্যান্ডউইচ বানানো হবে, এসব খাবারের জন্য নতুন নতুন দোকান দেয়া হবে, সেসব দোকান থেকে বিভিন্ন আকর্ষনীয় অফার আসবে আর

কিভাবে এগুলো আরো বাড়ানো যায় সেই চিন্তা করা হবে, এবং অন্যদেরও এটা খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হবে?

'জরুরত' এর দর্শন কি এই জন্য যে, এর প্রচার প্রসারের জন্য বড় বড় সমাবেশ করা হবে, শহর ও গ্রামের গুরুত্বপূর্ন পয়েন্টে, টিভি ও পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে আর কোটি কোটি টাকা এর পেছনে ঢালা হবে?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভোট ও নির্বাচনের ব্যাপারে, এমনকি খোদ গণতন্ত্রের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান ওপরের কোন অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়?

৫) আরো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, 'জরুরত' এর ভিত্তিতে কোন বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য কী? সেই জিনিসকে সাময়িকভাবে মেনে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা। সেটাকে জীবনের আবশ্যিক অংশ বানানো উদ্দেশ্য না। status quo বা বিদ্যমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা উদ্দেশ্য না। ফিকহের একটি মূলনীতি হল, **(ما جاز لعذر بطل بزواله)** ওজরের কারণে যেই বস্তু হালাল হয়, ওজর দূর হওয়ার সাথে সাথে তার বৈধতা বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের কারণে কোন হারাম বস্তু বৈধ স্বীকৃতি দেয়ার দাবি হল সেটাকে নিশ্চিহ্ন করা, প্রতিষ্ঠা করা নয়। কারণ 'জরুরত' এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অস্থায়ী হওয়া। তো যে ব্যবস্থা ও পরিস্থিতিতে অপারগতা ও নিরুপায় হবার কথা বলে ভোট দেয়াকে আবশ্যিক সাব্যস্ত করা হচ্ছে, সেই পরিস্থিতি দূর করার জন্য কী করা হচ্ছে? দীর্ঘমেয়াদে যেন ভোট দিতে না হয়, গণতন্ত্র থেকে বের হয়ে আসা যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য কী করা হচ্ছে বা কোন রূপরেখা দেয়া হয়েছে? আমার জানামতে এমন কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান বা রূপরেখা এই মতের অনুসারীরা দেননি। যদি জানায় ভুল থাকে তাহলে সহৃদয় পাঠক শুধরে দেবেন।

আর যদি কেউ বলেন মাদ্রাসাকেন্দ্রিক যে কার্যক্রম আছে সেটাই এই ব্যবস্থা দূর করার পদ্ধতি, তাহলে তার সেই কথা নিশ্চিতভাবেই ভুল। কারণ মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা বের হচ্ছেন তাদের মধ্যে দিন দিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা মানুষের সংখ্যা কমছে, এবং আরো উদারভাবে একে স্বীকৃতি দেয়া মানুষে সংখ্যা বাড়ছে। আর সাধারণ জনগণের মধ্য গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ হবার ব্যাপারে ব্যাপক অজ্ঞতার একটা বড় কারণও এটা। কাজেই পদ্ধতি যদি এটাই হয় তাহলে সেই

পদ্ধতি ফেইল করেছে। নতুন পদ্ধতির কথা ভাবা উচিৎ। যেহেতু জরুরতের অজুহাত দিলেও দীর্ঘমেয়াদে এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার কোন চেষ্টা কিংবা প্রস্তাবনাও তাদের কাছ থেকে আসছে না, তাই অ্যাট বেস্ট জরুরতের কারণে ভোট-নির্বাচন বৈধ ও আবশ্যিক হবার ব্যাপারে তাদের এই অবস্থান অসম্পূর্ন, ব্যাপকভাবে ইনকন্সিসটেন্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ।

৬) যদি ধরে নেয়া হয়, ভোট ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ কোন ধরনের রুখসত (অবকাশ, ছাড়) - সেক্ষেত্রে ভাবার বিষয় হল রুখসতের ব্যাপক প্রচলনকে আবশ্যিকভাবে মূল এবং একমাত্র স্ট্র্যাটিজি হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ কি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে পিছু হটা না? কোন কৌশলী কাজের উদ্দেশ্য কি 'রুখসত' এবং জরুরত' এর ব্যাপক প্রচলন করা? নাকি মূল লক্ষ্যের পথকে সহজ করে তোলা? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জীবন ব্যবস্থা সংস্কারের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নিশ্চিতভাবে এমন একটি মারহালা বা পর্যায় থাকে যেখানে মূল লক্ষ্যের চেয়ে নিচের তথা রুখসতের উপর আমল করতে হয়। কিন্তু রুখসতের উপর আমল করা বৈধ কি না তা নির্ভর করবে এর মাধ্যমে মূল বিষয়ের উপর আমল করা সম্ভব হবার ওপর। যদি রুখসত মূল লক্ষ্যকে সম্ভপর করে তোলার বদলে একে বিলুপ্তই করে দেয় এবং নিজেই মূল লক্ষ্যের স্থান দখল করে নেয়, তখন এই রুখসত তার বৈধতা হারিয়ে ফেলে। কারণ তার স্বত্ত্বাগত কোন বৈধতা নেই। উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জনের মাঝেই এর বৈধতা নিহিত থাকে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভোট-নির্বাচনের বৈধতা দেয়ার সময় উদ্দিষ্ট বিষয় আসলে কী?

অনন্তকাল পর্যন্ত মন্দের ভালো খুঁজে যাওয়া? যদি একথা বলা হয় তাহলে এমন ক্ষেত্রে জরুরত কিংবা রুখসতের অজুহাত আদৌ দেয়া যায় কি না সেই প্রশ্ন আসে। তারচেয়েও বড় আরেকটি প্রশ্ন আসে, যারা এমন অবস্থান গ্রহণ করেন তারা কি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আদৌ কোন অবস্থান নিতে চান নাকি আজীবন এমন অবস্থাতে কোনমতে টিকে থাকতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট?

মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেয়ার নীতির প্রয়োগ ভোট ও নির্বাচনের বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বহুল ব্যবহৃত; সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যুক্তি বা দাবি হল – এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ কারোই কাম্য

না, কিন্তু মন্দের ভালো ও তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকে বেছে নেয়ার জন্য, যুলুম কমানো ইত্যাদি কারণে এতে অংশগ্রহণ করা হয়।

প্রথমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তার বাস্তবতা অনুযায়ী যদি কুফর ও শিরক ধরা হয় তাহলে ভোট ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে মন্দের ভালো –এর নীতির প্রয়োগের জায়গা অত্যন্ত সংকুচীত হয়ে আসে।

*[অনেকে সূরা নাহলের ১০৬ আয়াত ও আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনার কথা বলে দাবি করতে চান যে বলপ্রয়োগের (ইকরাহ – **إكراه**) কারণে কুফর সাময়িকভাবে বৈধ হয়। আর তাই গণতন্ত্র কুফর হওয়া সত্ত্বেও এই দলিলের আলোকে তা সাময়িকভাবে বৈধ হতে পারে। এই ব্যাপারে লেখার একদম শেষে আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যদি আমরা তর্কের খাতিরে গণতন্ত্রের কুফর ও শিরক হওয়ার বিষয়টি বাদ দিয়ে চিন্তা করি তবুও এই পদ্ধতিতে আসলেই কি 'মন্দের ভালো' কে গ্রহণ করা হচ্ছে কি না, বাস্তবতা ও তথ্যের আলোকে সেটা স্পষ্ট হয় না।

১) প্রথমে দেখা দরকার আসলে কি এই পদ্ধতি মন্দের ভালো? মন্দের ভালো হিসেবে কেন A দলের বদলে B দলকে বেছে নেয়া হবে সেটা বোঝাতে ইসলামবিরোধী বিভিন্ন পলিসি বাস্তবায়ন, ইসলাম বিরোধিতার প্রসার, ইত্যাদি পয়েন্টের কথা আনা হয়। প্রশ্ন হল এই পলিসিগুলো কি দেশীয় সরকার বানাচ্ছে নাকি বাইরে থেকে এগুলো ঠিক করে দেয়া হচ্ছে আর দেশীয় সরকার (যে সরকারই হোক) সেগুলো বাস্তবায়ন করছে? ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে আইন, পাঠ্যবই ও সিলেবাস, সিডও সনদ, বাকস্বাধীনতার নামে ইসলাম অবমাননার বৈধতা – এরকম বেশিরভাগ পলিসি কিন্তু দেশীয় সরকার বানায় না, বাস্তবায়ন করে মাত্র। এই পলিসিগুলো আসে জাতিসঙ্ঘের মতো বৈশ্বিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে। সমকামিতা বিরোধী আইন বাতিল করার জন্যও জাতিসঙ্ঘ থেকেই বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজেই পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার চাপিয়ে দেয়া এই পলিসিগুলো প্রত্যাখ্যানের মতো মানসিকতা তৈরি হবার আগ পর্যন্ত এই ধরনের ক্ষেত্রে এক সরকার বদলে অন্য সরকার আসলে তেমন কোন পরিবর্তন আসবে না। এই ক্ষেত্রে মন্দের ভালো নীতি প্রয়োগের তেমন একটা সুযোগ নেই।

২) একই কথা প্রযোজ্য সামাজিক অবক্ষয়, যিনা-ফাহিশা-অশ্লীলতা-পর্নোগ্রাফির প্রসার, মাদকের ব্যাপক ব্যবহার, সামাজিক বন্ধনগুলোর ভাঙ্গন – ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন হবে এগুলো কি দেশীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে নাকি এগুলো পশ্চিমা কালচার এবং গ্লোবালাইযেইশানের প্রভাব? যদি এটা গ্লোবালাইযেইশানের প্রভাব হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে সরকার বদলে আপনি এটা থেকে বাঁচতে পারবেন না, এটা থেকে বাঁচার উপায় হল সামস্টিকভাবে র‍্যাডিযাডিকালি নিজেদের এই জোয়ার থেকে ইনসুলেইট (insulate) করা।

ওপরের দুটি পয়েন্টের মূল বক্তব্য বোঝার জন্য একটা বিষয় বোঝা দরকার। আজকের বিশ্বে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও (আমাদের মত দেশগুলোতে সত্যিকার অর্থে অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু গণতন্ত্র আছে বলা যায় না) মূল খেলোয়াড়রা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় না। বরং খেলা নিয়ন্ত্রন করে আঞ্চলিক ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেইশান, বৈশ্বিক ফাইন্যানশিয়াল ও মানি মার্কেটের নেতা, সুশীল সমাজ (যারা সংজ্ঞাগতভাবেই লিবারেল ও সেক্যুলার), মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, গোয়েন্দা সংস্থা, মিডিয়া (যেটা অল্প কয়েকটা কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে), দেশি বিদেশী এনজিও, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি। এরা সবাই হল স্টেইকহোল্ডার যারা পেছন থেকে পলিসি তৈরি করে। আর সামনে থেকে রাজনীতিবিদরা সেগুলো বাস্তবায়ন করে। নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা পরিবর্তনের ব্যাপারটা অনেকটা কাস্টোমারের পছন্দে কোন দোকানের সেইলসম্যানের বদলানোর মতো। এতে বাহ্যিক একটা পরিবর্তন আসে কিন্তু দোকানে আগে যা বিক্রি হচ্ছিল, এখনো সেটাই বিক্রি হয়। সেইলসম্যান ঐ জিনিসগুলোই বিক্রি করে যেগুলো স্টেইকহোল্ডাররা ঠিক করে দেয়। কাস্টোমারের চাহিদা এখানে গুরুত্বপূর্ন না, স্টেইকহোল্ডারের প্রফিট গুরুত্বপূর্ন। সুতরাং বর্তমানে ম্যাচিউরড ডেমোক্রেসিগুলোতেও নির্বাচন হল একটা বাহ্যিক পরিবর্তন মাত্র। ইউরোপ এবং অ্যামেরিকার বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদদের অনেকেই অনেক দিন ধরে এই কথাগুলো বলছেন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্টেইকহোল্ডার কারা? দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাতন্ত্র, জুডিশিয়ারি, মিডিয়া (কে কতোটা স্বাধীন, পাঠক ভালো বুঝবেন), আর্মি, দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এবিসিডি এইজেন্সি, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং এ ধরনের

অন্যান্য সংস্থা, ভারত, অ্যামেরিকা, এবং জমিদার টাইপের পারিবারিক রাজনীতি করা একটা শ্রেণী – এরা সবাই মিলে ঠিক করে পরের এক মাসে বা এক বছরে এই ভূখন্ডে কী কী বাস্তবায়ন করা হবে। এখানে জনগণের বলার, করার তেমন কিছু নেই। থিওরিতে যাই থাক বর্তমাণ বাস্তবতা হল নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষকে শুধু এই ভুল বুঝটা দেয়া হয় যে 'যা হচ্ছে তা অধিকাংশের ইচ্ছে অনুযায়ীই হচ্ছে'। কিন্তু আসলে যা হচ্ছে তা অধিকাংশের না বরং অভিজাতদের ইচ্ছে অনুযায়ী হচ্ছে। সুতরাং এই বাস্তবতার আলোকে মন্দের ভালো বেছে নেয়ার দাবি অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, কারণ যে পরিবর্তনটা আপনি দেখছেন সেটা কসমেটিক, এসব ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে এই নীতি প্রয়োগের সুযোগই আপনাকে দেয়া হচ্ছে না।

এক্কেবারে সহজ-সরল ভাষায় বললে – A দল বদলে যদি আগামীতে B দল আসে তারা এই স্টেইকহোল্ডারদের সমর্থন নিয়েই আসবে এবং তাদের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করবে। কেউ হয়তো একটু বেশি ভারত ঘেষা হবে কেউ একটু বেশি অ্যামেরিকাঘেষা। কিন্তু ওপরে ১ ও ২ নং পয়েন্টে বলা যুলুম কিংবা মন্দ গুলো প্রতিহত করার ক্ষেত্রে A বা B বা Z দল আসার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৩) অনেকে যুলুম কমানো পদ্ধতি হিসেবে নিরুপায় হয়ে মন্দের ভালো প্রার্থীকে ভোট দেয়ার কথা বলেন। এখানেও দাবিকে আমাদের বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রতি নির্বাচনের পর নেট যুলুমের মাত্রা ও পরিমাণ (ইসলাম ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোন থেকে, কোন দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে না) কি কমেছে? বর্তমানে বাংলাদেশে যুলুমের অবস্থা কী এরশাদের সময়ের চেয়ে ভালো? ক্লিয়ারলি যুলুম কমছে না। নির্বাচনে মন্দের ভালোকে ভোট দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে যুলুম কমানো যাচ্ছে না এটা প্রমাণিত সত্য। ৯২ থেকে ২৬ বছরের দেশীয় ইতিহাস তাই বলে। চাইলে বাইরের ইতিহাসও টানা যায়, তবে সেটার প্রয়োজন নাই। বাস্তবতা হল ভোটের মাধ্যমে যুলুম কমানো যাবে, এটা একটা ধারণা মাত্র এবং ভুল ধারণা। তাত্ত্বিকভাবে এটাকে লজিকাল মনে হলেও বাস্তবে এটার প্রতিফলন দেখা যায় না। নির্বাচনে ভোট দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে নেট যুলুম কমে এটার স্পষ্ট প্রমাণ আনার পর এই দাবিকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। যেমন একজন তালিবুল ইলম ভাই বলেছেন, সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রত্যাশা, সম্ভাব্যতা আর প্রবল সম্ভাবনার (গালেবে দ্বন) ভিত্তিতে। সমস্ত বোধবুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনাবোধ, যুক্তি, এটাই

বলে যে নির্বাচনে ভোট দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে যুলুম কমে না। এবং ভবিষ্যতেও কমবে না এই সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনাই প্রবল। তবে কিছু নির্দিষ্ট দলের কিংবা শ্রেণীর মানুষের ওপর যুলুমের পরিমানে তারতম্য হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যদি এই নীতির আলোকে ভোট দেয়াকে বৈধতা দেয়া হয়ও তাহলে তা খাসভাবে নির্দিষ্ট কিছু লোকের জণ্য হলেও হতে পারে, ঢালাওভাবে ভোট দিতেই হবে, এই দাবি এই বাস্তবতা থেকে প্রমাণিত হয় না।

৪) যদি জাতীয় পর্যায়ে আসলেই সত্যিকারের কোন পরিবর্তন আনতে চান তাহলে এমন দলকে ভোট দেয়ার কোন অর্থই নেই যারা সরকার গঠন করতে পারবে না। ভোট দিলে ঐ দলকেই দেয়া উচিৎ যারা সরকার গঠন করে, জাতীয় পর্যায়ে যুলুম কমানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে পারবে বা অ্যাটলিস্ট 'মন্দের ভালো' হতে পারবে। সেক্ষেত্রে যতোগুলো কওমি রাজনৈতিক দল আছে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই) সহ, তাদের ভোট দেয়া exercise in futility - অর্থহীন। ভোট যদি আমানত হয় তাহলে সেটা বুঝেশুনেই দেয়া উচিৎ। এমন কাউকে দিয়ে লাভ নেই যে সংসদে গিয়ে তেমন কিছুই করতে পারবে না, কারণ তার যথেষ্ট সিট নাই। একইসাথে এভাবে দলে দলে বিভক্ত হওয়া, যেটা বাংলাদেশে ইসলামী গণতান্ত্রিক দলগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হয়েছে (জামায়েত ইসলামী ছাড়া) অর্থহীন এবং কাউন্টার প্রডাক্টিভ। একটা দল থাকা উচিৎ যাতে করে সম্ভাব্য ভোট ও আসনের সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং সত্যিকার অর্থে কোন পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা বাড়ানো যায়। এই ধরনের যুক্তি অনুযায়ী মন্দের ভালোর নীতির ওপর আমল করতে গেলে উচিৎ ছিল জামায়েতে ইসলামীকে ভোট দেয়া এবং দিতে বলা অথবা বড় দুটি দলের কোন একটায় যোগ দেয়া।

আর যদি মন্দের ভালোর কথাই বলা হয় তাহলে বিদ্যমান সরকারের মধ্যে ঢুকে কিছু 'ভালো' করার চেষ্টা করতে কী সমস্যা? ৯১ পর্যন্ত 'মন্দের ভালো' এর ওপর আমল কিভাবে হয়েছে? তখন তো গণতন্ত্র ছিল না? তখনো সরকারব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। সুতরাং যে অবস্থা এর আগে আরামসেই কাটিয়ে আসা হয়েছে সেই অবস্থা আবার আসলে 'বিকল্প কী হবে?' এই প্রশ্ন নিয়ে এতো উতলা হবার অর্থ কী?

৫) যুলুম কমানোর মানে কী? যুলুম কমানো মানে তো শুধু যুলুমের বিরোধিতা না, বরং কোন যুলুমকে থামিয়ে দেয়া। বা নতুন কোন যুলুমের প্রচলন আটকে দেয়া। বাংলাদেশের ৪৭ বছরের ইতিহাস থেকে বলুন ভোটের মাধ্যমে কোন কোন যুলুমগুলো আমরা থামাতে পেরেছি? আমরা তো অনেকদিন ভোট দিয়ে যাচ্ছি। যুলুম কি দিন দিন কমছে নাকি বাড়ছে? গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে পাচ-ছয় দশক আগে দিন দিন ইসলাম ও মুসলিমরা কি শক্তিশালী হয়েছে? সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের প্রভাব কি বেড়েছে? নাকি উল্টোটা হয়েছে? চক্রবৃদ্ধি হারে শুধু মন্দই বেড়েছে? না মন্দ কমেছে, না যুলুম কমেছে, না ইসলামবিরোধিতা কমেছে – তাহলে যে দাবিটা করা হচ্ছে সেটার বাস্তবতা কোথায়?

৬) আসন্ন নির্বাচনে যদি ৬০-৭০% ভোটারও ভোট দিতে পারেন তাহলে ফলাফল কী হবে সেটা মোটামুটিই সবাই জানেন। কিন্তু এটাও মোটামুটি সবাই জানেন যে এই ভোটারদের ভোট দিতে পারার ও অনেকেরই কাঙ্ক্ষিত সেই ফলাফল আসার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তার মানে শুধু মানুষ ভোট দিতে রাজি হওয়া কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও যুলুম বন্ধের জন্য যথেষ্ট না। সেটার জন্য নুন্যতম একটা লেভেলে পার্টিসিপেটরি ডেমোক্রেসি থাকা লাগবে। যেমন ধরুন সিরিয়াতে নিয়মিত ভোট হয়, হচ্ছে। কিন্তু যুলুম তো থামছে না। কারণ সেখানে ঠিকমতো নির্বাচন হচ্ছে না। সেখানে আসলে গণতন্ত্র নেই। অংশগ্রহনমূলক নির্বাচন নেই। তাহলে এই ফ্রেইমওয়ার্কের মধ্যে মন্দের ভালো পর্যন্ত যেতে হলেও আপনাকে আগে কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। শুধু ভোট দিতে হবে বলে বসে থাকলে হবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে মন্দের ভালো ঠিক করার জন্যও একটা নূন্যতম পরিমাণ নিয়মতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ গণতন্ত্র লাগবে। সেটা কিভাবে করবেন?

তাহলে কি আগে অংশগ্রহনমূলক সঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করা হবে, তারপর সেখানে মন্দের ভালো খোঁজা হবে তারপর আরো একশো বছর পর গিয়ে আপনি চিন্তা করবেন status quo কে বদলে কিভাবে ইসলামী শাসন আনা যায়? যেভাবে অনেক পলিটিকাল ইসলামিস্ট কিংবা 'গরীবের সুলতান সুলেমান' এখন করছে? কিন্তু সেটাও তো বলা হচ্ছে না। নাকি আপনি মাঝের অর্থহীন দুটা ধাপ বাদ দিয়ে এবং আরো একশো বছরের অপেক্ষা বাদ দিয়ে সমস্যার মূলে যাবেন?

৮) ভোট ও নির্বাচনের বৈধতা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে এটা 'মন্দের ভালো'। কিন্তু সমস্যা হল, Lesser of two evils - বা মন্দের ভালো নীতির অনুসরনের অবশ্যম্ভাবী রেসাল্ট দীর্ঘ মেয়াদে সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বে মন্দ বা evil বৃদ্ধি পাওয়া। সিম্পল গেইম থিওরি দিয়ে এটা ম্যাথমেটিকালি প্রমান করা সম্ভব। আমরা যদি সবসময় মন্দের ভালো - কেই বেছে নেয়ার মূলনীতি নেই তাহলে বাই ডেফিনিশান আমরা সবসময় মন্দকে বেছে নিচ্ছি। এতে করে দিনদিন মন্দ বাড়তেই থাকবে। স্পটতই মন্দের ভালো নীতিকে মূল ও স্থায়ী স্ট্র্যাটিজি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এই নীতি প্রয়োগের একটা সীমারেখা থাকতে হবে। এটা জরুরতের মতোই সাময়িকভাবে কৌশল হতে পারে, যার উদ্দেশ্য হবে সাময়িকভাবে এই নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে মন্দের প্রভাবকে দূর করে ভালোকে গ্রহণ করা। কিন্তু এটাই স্থায়ী স্ট্র্যাটিজি হতে পারেনা, কারণ তাহলে সমাজে মন্দ বাড়তেই থাকবে।

সাধারণত সংস্কারমূলক পলিসির ৩টা পর্যায় থাকে শর্ট রান, মিডল রান আর লং রান। লং রানে পলিসির ফসল ঘরে তলার চেষ্টা করা হয়। মিডল রানে নিজেদের চারপাশের পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বদলানো চেষ্টা করা হয়।

শর্ট রানে মনোযোগ থাকে তাৎক্ষনিক করণীয় এর দিকে। যেমন এই বছর আমাদের নির্বাচনে ভোট দেয়া উচিৎ কি না? যদি উচিৎ হয়, তাহলে কোন দলকে? আমাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য হরতাল দিতে হবে নাকি অন্য কিছু? ইত্যাদি বিষয়। সাধারনত শর্ট রানে এমন কিছু করা হয় না যাতে নিজেদের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ বদলে যায়। বরং বিদ্যমান পরিবেশের ভেতর থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিন পর্যায়ের মধ্যে status quo বা বিদ্যমান অবস্থার সাথে সবচেয়ে বেশি আপস এই পর্যায়ে ঘটে। এজন্য এই পর্যায়ে অনেক সময় 'সবচেয়ে অল্প মাত্রার' মন্দকে গ্রহণ করতে হয়। short run-এ এমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, যার দরুন long run- এ কাজ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং সবশেষে কাজ করার অবস্থানই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বরং এ পর্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে।

পলিসির এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে ভোট ও নির্বাচনকে শর্ট রানে কিছুটা জাস্টিফাই হয়তো করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে ভোট ও নির্বাচনকে যারা

মন্দের ভালোর নীতির আলোকে বৈধতা দিচ্ছেন তাদের Long Run-এর উদ্দেশ্য কী? আর এই শর্ট রান আর কয় দশক চলবে?

দেখুন মন্দের ভালো গ্রহনের নীতির আলোকে প্রায় ছয় দশক ধরে ভোট এবং নির্বাচনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এর ফলাফল হল ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর কমেছে ইসলামবিরোধী পলিসি বেড়েছে, যুলুম বেড়েছে। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়েছে। ভোট ও নির্বাচনকে বৈধতা দেয়ার এই অবস্থানের সবচেয়ে বড় ও মারাত্বক সমস্যা হল এখানে এমন একটা অর্ধেক সমাধান দেয়া হচ্ছে যেটা সমস্যাকে টিকিয়ে রাখছে, এবং সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করছে। বাস্তবতা হল এই 'সমাধান' কোন সমাধান তো না-ই বরং সমস্যার অংশ। এটা গণতন্ত্রের বাস্তবতা জানা ও অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে, এটা মানুষের মনে গণতন্ত্রকে ঢালাওভাবে বৈধতা তৈরি করছে (কারণ গণতন্ত্র কুফরি হবার কথা স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে না), এবং ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে।

কাজেই তাত্ত্বিকভাবে যদিও মন্দের ভালো ও তুলনামূলক কম খারাপের নীতি গ্রহনের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই পলিসি অনুসরণের ফলে মন্দ বাড়ছে। মুমিন এক গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না, বারবার একই ভুল করে না। কিন্তু স্পষ্ট রেসাল্ট সামনে থাকার পরও দশকের পর দশক একই ধরনের ইলযামী ও মানতেকী কথাবার্তা দিয়ে একটা ভুল টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আরো বড় করা হচ্ছে। এই পলিসি কোনদিনও কাঙ্ক্ষিত ইসলামী শাসন তো আনবেই না, মন্দের ভালোও আনবে না, বরং ক্রমান্বয়ে আমাদের status quo এর সাথে আরো বেশি করে মিশিয়ে দেবে। আমাদের আরো বেশি করে status quo এর সাথে assimilate করাবে। এই পুরো অ্যাপ্রোচটাই হল বিদ্যমান অবস্থার সাথে fit-in বা মানিয়ে নেয়ার পদ্ধতি। status quo এবং সিস্টেমকে বদলানো এই অ্যাপ্রোচের উদ্দেশ্যও না এবং এর দ্বারা সম্ভবও না, যদিও নিশ্চয় সেই ইচ্ছা এই অ্যাপ্রোচ গ্রহনকারীদের মধ্যে আছে।

নির্বাচন আর গণতন্ত্র এক না। নির্বাচন ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতিমাত্র

১) অনেকে এটা বলে থাকেন যে নির্বাচন আর গণতন্ত্র এক না। গণতন্ত্র কুফরি মতাদর্শ কিন্তু নির্বাচন সত্ত্বাগতভাবে কুফরি না। এ কথা সত্য। ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচন, কোন জামাত বা গোষ্ঠীর নেতা নির্বাচনসহ অনেক কিছুই সত্ত্বাগতভাবে কুফর তো না-ই হারামও না। কিন্তু আপাতভাবে সঠিক এ কথার মধ্যে একটা বড়সড় ফাঁকি আছে। সেটা হল এখানে যে নির্বাচনের কথা বলে হচ্ছে, যেই নির্বাচনে ভোট দেয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটা এই ধরনের নির্দোষ কোন নির্বাচন না। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের আইনসভার সদস্য, এমপি (MP – যার শাব্দিক অর্থই হল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট/Member of Parliament) নির্ধারনের নির্বাচন। কাজেই যদিও গণতন্ত্র মানেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন না, কিন্তু অবশ্যই জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্রের অংশ।

এই নির্বাচনে যারা জিতবে তারাই সংসদে যাবে। আইনসভার সদস্য হবে। সেক্যুলার সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে আইন বানাবে। সেক্যুলার সংবিধান সংরক্ষন ও এ অনুযায়ী শাসনের শপথ করবে। আল্লাহ্*র আইন ব্যাতীত অপর আইন দিয়ে শাসন করবে। আল্লাহ্*র আইনকে অকার্যকর করবে। গায়রুল্লাহর আইনের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করবে।

এই নির্বাচনে যারা ভোট দেবে তারা এই কাজগুলোর জন্য একজন লোকের জন্য ভোট দিবে। মাসিক আল-কাউসারের ভাষায় 'সুপারিশ, সাক্ষ্য ও প্রতিনিধিত্বের সনদ' দেবে। মাসিক আল কাউসারের লেখায় উল্লেখিত কুরআনুল করীমের আয়াতের এই তর্জমা অনুযায়ীই ভোটদাতারা এর দায়ভার বহন করবেন। 'যে ভালো সুপারিশ করবে সে তার নেকীর ভাগী হবে। আর যে মন্দ সুপারিশ করবে সেও মন্দের হিস্যা পাবে।' -সূরা নিসা, আয়াত ৮৫ কাজেই নির্বাচন মানে গণতন্ত্র না, একথা এখানে প্রযোজ্য না। কারণ গণতন্ত্রের যে বিষয়গুলো কুফর ও শিরক সেগুলোতে অংশগ্রহনের জন্যই এই নির্বাচন।

২) এমনো দাবি করা হয় যে নির্বাচন শুধু একটি পদ্ধতি। ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতি যুগে যুগে এক ছিল। যেমন আবু জাহল যুদ্ধ করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও যুদ্ধ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন হবার কারণে হুকুম বদলে গেছে। এই কথাটার অবস্থাও আগের কথার মতোই, আপাতভাবে ঠিক মনে হলেও ভেতরে সমস্যা আছে।

যেমনটা আমরা বললাম, সংসদ নির্বাচন কোন নির্দোষ প্রক্রিয়া না। এটার উদ্দেশ্যই হল সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। এই অর্থে এর সাথে যুদ্ধের তুলনা সঠিক না। কারণ গণতন্ত্রের শিরক ও কুফর কাজগুলোতে অংশগ্রহনের জন্যই সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহন করা হচ্ছে। কারো যদি এই ইচ্ছা নাও থাকে তবুও পার্লামেন্টের সদস্য হতে হলে তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বে এই কুফরের ওপর শপথ নিতে হবে, এবং যেই entity বা body আইন প্রনয়ন, গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে শাসন ইত্যাদি করছে, সেটার অংশ হতে হচ্ছে। কাজেই যুদ্ধের সাথে এখানে কিয়াস চলে না।

বরং সংসদের জন্য শপথ নেয়ার মিল ঐ অবস্থার সাথে যেখানে দুইজন ব্যক্তি দুর্গা কিংবা হুবালের নামে শপথ নেয় কিন্তু দুইজনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। একজনের অন্তরে শিরক, আরেকজন আল্লাহ্*র ওপর বিশ্বাস করে। আর সংসদের আইন প্রনয়ন, আল্লাহ্*র আইন বাতিল করা ইত্যাদি কাজের অংশ হবার সাদৃশ্য এমন দুই ব্যাক্তির সাথে যেখানে তারা দুজনেই গায়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করলো, কিন্তু একজন অন্তরে শিরক নিয়ে করলো আর আরেকজন অন্তরে আল্লাহ্*র ওপর বিশ্বাস নিয়ে করলো। প্রথম কাজের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ (ইকরাহ) ইত্যাদির অজুহাত দিয়ে হয়তো কুফরি উচ্চারণকে জায়েজ করা যায়, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে কাউকে জোর করে সাংসদ বানানো হচ্ছে না বরং মানুষ জোর করে সংসদে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় কাজ তো কুফর আকবর-ই। কাজেই এভাবে যুদ্ধের ময়দানের সাথে তুলনা সঠিক।

৩) এই যুক্তিগুলো থেকে এই ধরনের অবস্থান ও চিন্তার মৌলিক একটি সমস্যা বেড়িয়ে আসে। আর সেটা হল সম্পূর্নতা (totality) থেকে ছেড়ে শাখাগত সমস্যার দিকেই শুধু ফোকাস করা। সার্বিক সমস্যার দিকে না তাকিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট কিছু অংশের দিকে তাকানো। (كل totality) তথা পুরো বিষয়ের বদলে جز শাখাগত দিকে মনোযোগ দেয়া। সম্পূর্ণকে ছেড়ে আংশিককে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দর্শন ও পদ্ধতিকে totality থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা এবং শাখাগত কিছু সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেই সেগুলোর ভিত্তিতে ইসলাম ও পাশ্চাত্যকে এক করার চেষ্টা করার যার জ্বলন্ত একটি প্রমাণ হলো, গণতন্ত্র-ভোট-নির্বাচনের

জন্য এধরনের কথাবার্তা। এনলাইটেনমেন্টের ভিত্তি ওপর গড়ে ওঠা পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ মার্কেট এবং গণতন্ত্র সৃষ্টিই হয়েছে নির্দিষ্ট মতাদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, কিন্তু অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ আজো এগুলোকে শুধু value-neutral প্রয়োগিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো (technical operational process and structure) হিসেবে দেখছেন। তারা মনে করেন, এসব প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামো ব্যবহার করে সব ধরনের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব, ইসলামী উদ্দেশ্য অর্জনও সম্ভব। দর্শনগতভাবে এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ কাঠামো এবং উদ্দেশ্যের সম্পর্ক দেহ ও আত্মার মতো। এই ভুল ধারণার কারণে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বৈধ করার জন্য ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ বিচিত্র ধরনের দর্শন আবিষ্কার করছেন। পূজা শিরক কিন্তু পুরোহিত হবার জন্য স্বেচ্ছায় আরো দশজনের সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করা জায়েজ!

৪) যেকোন কিছুর বাস্তবতা নিহিত থাকে তার টোটালিটির মাঝে। যখন এই টোটালিটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে, আলাদাভাবে দেখা হবে, কখন বাস্তবতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কোন নতুন সমস্যাকে যখন তার সম্পূর্ণতা (totality) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হবে, তখন তার আসল রূপই পাল্টে যাবে। ফলে সমস্যার প্রকৃত রূপ অনুধাবন ও সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণতাকে উপেক্ষা করে বিদ্যমান ব্যবস্থায় fit in করার এই নীতির ভিত্তিতেই নিজেদের ১ হাজার বছরের সোনালী ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বদলে আমরা ইংরেজদেরই দেয়া গণতন্ত্রে অংশ নিচ্ছি। মজার বিষয় হল, স্বাধীনতা অর্জনের পরও আমরা নিজেদের ঐতিহাসিক অনুশাসনে (যেমন মোঘল বা তুর্কী খিলাফাহ ব্যবস্থা) ফিরে যাইনি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছি, গ্রহণ করে নিয়েছি, বৈধতা দিয়েছি এবং এটাকেই ইসলামী বানানোর চেষ্টা শুরু করেছি।

৫) যখন সামগ্রিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুপস্থিত তখন totality কে প্রত্যাখ্যান করে শুধু শাখাগত বিষয়ে ফোকাস করার অর্থ হল মূল সমস্যার সমাধানের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিছক নবউদ্ভাবিত বিভিন্ন শাখাগত সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকা। ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে এই কর্মপদ্ধতি সঠিক, কিন্তু ইসলামী শাসনের অনুপস্থিতিতে সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই একই পদ্ধতি সমূহ বিপদের কারণ। কারণ যেই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এখন fit in-

করার পদ্ধতির সবক দেয়া হচ্ছে, সেই পরিবেশটাই অনৈসলামিক। এমন অবস্থায় fit in- করার নীতি অবলম্বনে অসংখ্য ক্ষতি আছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল, সমাজ ও রাষ্ট্রে সেক্যুলার ব্যবস্থার প্রভাব ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে আর এর ফলে উলামায়ে কেরামের প্রভাব আরো কমছে, সীমাবদ্ধত ও অপারগতা আরো বাড়ছে। বাস্তবতা হল 'শাখা' এর বদলে পুরো ব্যবস্থাকে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু বানানোর আগে অবস্থার পরিবর্তন হবে না, দুর্বলতা কমবে না বরং বাড়বে, মন্দও বাড়বে আর পরিস্থিতিও আরো খারাপ হবে, 'অপারগতা ও অপরিহার্যতাও' বেড়েই যাবে।

বিকল্প কী?

নির্বাচন ও ভোটের বৈধতার ব্যাপারে অবস্থানের বিরোধিতা করা হলে অনেকেই প্রশ্ন করেন 'তাহলে বিকল্প কী'? তোমরা কোন বিকল্প দিচ্ছো না, আবার বিরোধিতাও করছো এটা কেমন কথা?

১) প্রথমত একটা কথা বলা দরকার। বর্তমানে পুরো বিশ্ব 'দারুল আমানে পরিণত' হবার এই যুগে ইসলামের এমন অনেক বিধিবিধান আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলা বেআইনি। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যেমন ১৮ বছরের নিচে কারো বিয়ে দেয়া বাংলাদেশের আইনে বেআইনি। কিন্তু এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী?

কাজেই যারা গণতন্ত্রকে বারবার কুফর ও শিরক বলছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে নববী মানহাজকে চিহ্নিত করছেন, ফাতহুল মক্কার কথা বলছেন কিংবা সূরা আনফাল কিংবা সূরা তাওবাহ এর দলীল দিচ্ছেন তখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বলতে তারা কী বোঝাচ্ছেন সেটা কোন ইসলামপন্থীর না বোঝার কিছু নেই। এটা হতে পারে তারা বিভিন্ন ধরনের অঞ্চলে, বিভিন্ন বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপটের আলোকে কিভাবে এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের কথা বলছেন সেটা পরিষ্কার না, অর্থাৎ পদ্ধতির বাস্তবায়ন কিভাবে হবে বা খুঁটিনাটি বোঝা যাচ্ছে না এটা বলা যেতে পারে এবং এটা যৌক্তিকও। কিন্তু 'তারা আসলে কীসের কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না' জাতীয় কথা জেনেশুনে, বর্তমান বাস্তবতায় বলা কিছুটা হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার প্রমান দেয়।

আর গত প্রায় চার দশকে এই প্রশ্ন নিয়ে ডজন ডজন বই আর হাজার হাজার প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, সেগুলোকে 'অন্য মাসলাকের লোকের লেখা' বলে পাত্তাই

না দিয়ে অথবা খোঁজার চেষ্টাও না করে, পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছি, এমন দাবি করাটাও সৎ মনে হয় না।

২) দ্বিতীয়ত, বাস্তবতা হল যখনই বিকল্পের কথা বলা হয়েছে তখন বিশাল একটা অংশ 'অনুপযুক্ত' কিংবা 'আম্রিকা সব দেখতেয়াছে, সব শুনতেয়াছে' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে বলেছেন। "জনাব! আমাদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা না করে নিজে একটি পারফেক্ট বিকল্প উপহার দিন। আর না হয় সমালোচনায় নিজের সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন।"

ব্যাপারটা যেন এমন যে যে আলেম কিংবা মুফতীর কাছে কোন মাসআলার এমন কোন বিকল্প নেই যেটা প্রশ্নকারীর কাছে আমলযোগ্য মনে হবে, তার কাছ থেকে ফতোয়া প্রদানের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া উচিৎ। এ ধরনের ভুয়া নীতি অনুসরণ করতে গেলে অনুযায়ী আমাদের মাদরাসাগুলো থেকে জারি করা অসংখ্য ফতোয়াই পরিত্যক্ত ঠেকে। দুনিয়ার কোন মুফতি এই মূলনীতির আওতা থেকে নিরাপদ না। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, কোন জিনিসকে হারাম ফতোয়ার দেয়ার আগে মুফতী সাহেবের দায়িত্ব হল এর বিকল্প বলে দেয়া। যদি তাঁরা কাছে বিকল্প না থাকে, তাহলে তিনি এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারবেন না। যেন ইসলাম বাতিল চাহিদাকে খতম করতে না বরং সব কিছুর বিকল্প দেয়ার জন্য এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত 'ইসলাম আনুষ্ঠানিকতা'-র ভুল ধারণার ফসল। অর্থাৎ (দ্বীন ও জীবনব্যবস্থা) হিসেবে ইসলামে না বোঝার কারণেই এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওজর নির্ভর এক আধুনিক পদ্ধতি জন্ম নিয়েছে। যা মূল শরীয়তের উপর আমল করার বদলে শুধু রুখসতের সবক দেয় এবং শরয়ী বাহানা খোঁজার মাধ্যমে এক হীন পথ তৈরি করে।

৩) এমনো বলা হয় যে গণতান্ত্রিক দেশে থাকেন, খান, ফেইসবুক চালান, এর বিকল্পও দিতে পারেন না, তাহলে বিরোধিতা করেন কেন?

কী বিচিত্র কথা বার্তা। যেন নিজের পছন্দমতো বিকল্প না পেলে কুফর কে কুফর বলা যাবে না, হারামকে হারাম বলা যাবে না! ইতিহাসে এমন অনেক নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) ছিলেন যাদের অনুসারীরা ছিল সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা নিজ উম্মতকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ফিরে আসত না। এর মানে কি আম্বিয়ায়ে কেরাম বিকল্প পেশ করা ছাড়া

খারাপ কাজ থেকে বারণ করে গর্হিত ও অনর্থক কাজ করে গেছেন? নাউযুবিল্লাহ। তাঁদের ওপর কি উম্মতের সুবিধার্থে হারাম চাহিদা পূরণের শরয়ী বিকল্প দেয়া আবশ্যিক ছিল? স্রষ্টা প্রদত্ত শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োগ করা, নবী-রাসূলগণের কাজ ছিল না। বরং তাঁদের মিশন ছিল ইসলামের অনুগত্য করার জন্য মানবজাতিকে পরিবর্তন করা। তাঁরা যুগের কারণে ইসলামে বদলাননি, যুগকে বদলেছেন।

সমস্ত উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত ফতোয়া হল, জুমার আজানের পর কেনাবেচা হারাম। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, জুমার আজানের পর বাজার-মার্কেট বন্ধ হয় না এবং মানুষ মনোযোগের সাথে কেনা-কাটায় ব্যস্ত থাকে। এখন কি উক্ত ফতোয়া অনর্থক হবে? এর থেকে রুজু করা হবে? এমনিভাবে সমস্ত বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম নারীপুরুষের সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন। তবুও ক্রমাগত নতুন নতুন সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখন কি একথা বলা হবে যে, উলামায়ে কেরাম যেহেতু বিকল্প স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি তৈরি করতে পারে নি তাই সহশিক্ষা হারামের ফতোয়া অনর্থক? বাস্তবায়ন করার শক্তি না থাকলে সঠিক হুকুম বলা যাবে না, এই মূলনীতি কোথায় আছে? বিকল্প পছন্দমতো বিকল্প না দিতে পারলে ভুলকে ভুল বলা যাবে না?

৪) কার্যকরী (পছন্দমতো) বিকল্পের দর্শন মূলত দাবি করে যে, প্রথমে বিকল্প পদ্ধতির একটি পরিপূর্ণ নকশা তৈরি করা হবে তারপর সেই নকশা পছন্দ হলে, আমরা সেটা গ্রহণ করবো। যেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন বাসা বদল করার মতো কিছু। প্রথমে নতুন বাসা খুঁজে বের করো, তারপর আমরা এক বাসা ছেড়ে অন্যটায় গিয়ে উঠবো। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন কোনো বিচ্ছিন্ন one-off event বা ঘটনা না, বরং একটি প্রক্রিয়া। আপনি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে না ঢুকে কিভাবে আগাগোড়া খুটিনাটি সব জানতে চান আর কেনই বা আপনাকে জানানো হবে? আর এমন বিস্তারিত বিবরণ কে-ইবা বানিয়ে রাখে?

কুরআন ও হাদীস থাকার পর ও ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভব কেন হয়েছে? কারণ যদিও দিকনির্দেশনা পরিপূর্ণ কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্রমাগত এমন অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে উৎসের ওপর ভিত্তি করে সমাধান দিতে হয়। আদর্শের ও দিকনির্দেশনার প্রয়োগ কোন ক্ষেত্রে কীভাবে হবে সেটা ঠিক করতে হয়,

ক্যাটাগরাইয করতে হয়। এটা তাত্ত্বিকভাবে হয় না, দিকনির্দেশনা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে রিয়েলটাইমে হয়, অন দা গ্রাউন্ড হয়।

৫) সমাজ বিকল্পের দিকে কখন যাবে? যখন সমাজের মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি আসবে যে যেটা আছে সেটাকে বদলাতে হবে, একটা অন্য ব্যবস্থায় যেতে হবে। মানুষের মধ্যে যখন বিকল্পের চাহিদা তৈরি হবে। আর মানুষের মধ্য চাহিদার তীব্রতার ভিত্তি হলো, বিদ্যমান ব্যবস্থার ব্যাপারে মানুষ কতোটাঅতৃপ্ত এবং তাঁরা কতো শক্তভাবে এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি চায়। বিকল্পের সুযোগ তখনই আসবে যখন সমাজের একটি প্রভাবশালী কিংবা উল্লেখযোগ্যঅংশ বিদ্যমান ব্যবস্থার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনি যদি সমাজের মানুষকে বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে অসন্তুষ্ট হতে না দিয়ে, বিভিন্ন ধরনের status quo কে জাস্টিফাই করতে থাকেন, চলমান ব্যবস্থাকেই জোর করে বৈধতা দিতে থাকেন, দশকের পর দশক এভাবে তাদের বুঝ দিতে থাকেন যেভাবে চলছে চলুক সমস্যা নেই, বিকল্প দরকার এই বোধও যদি আপনি মানুষের তৈরি না করেন তাহলে সত্যিকারের বিকল্পের আসার প্রেক্ষাপট কিভাবে তৈরি হবে? আপনি যদি ক্রমাগত জাহিলিয়্যাতের ইসলামীকরন করে যান, এবং একেই ইসলাম বলে চালিয়ে দেন, তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে সত্যিকারের ইসলাম আনার চেতনা ও দাবি তৈরি হবে?

সুতরাং যেই বিষয়ের অনুপস্থিতিকে দলিল বানিয়ে ভোট ও নির্বাচনের বৈধতাদানকারীর প্রতিপক্ষকে চুপ করানোর চেষ্টা করছেন, সেটার উপস্থিতি কিংবা অর্জন নির্ভর করে সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ সেটা কামনা করার ওপর। কেননা এটা হতে পারে না যে, সমাজে কোনো বস্তুর একেবারেই চাহিদা নেই, অথচ তার উৎপাদনে ভীড় লেগে যাবে। কোন কিছুর অস্তিত্বের জন্য যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন, সেটা তখনই জোরদার হবে যখন সমাজ এই বিকল্পকে নিজেদের জন্য আবশ্যিক মনে করবে। এসব আজীব কথাবার্তা যে - বাতিলকে বাতিল বলো না। তাকে চলতে দাও এবং বাতিলের সরানোরআওয়াজও তুলবে না।

৬) বিকল্প কী হবে তার আংশিক আলোচনা আল-কাউসারের লেখাতেই উঠে এসেছে।

'আমাদের গুনাহ-অপকর্ম, দ্বীন-শরীয়তের প্রতি উদাসীনতা, সাধারণ

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতি এবং তাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দেওয়া ও সহীহ মানসিকতা তৈরি করার ব্যাপারে আমাদের আলেমসমাজ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ব্যর্থতা আমাদেরকে এ অধঃপতনে নামিয়েছে। যে পর্যন্ত সাধারণ লোকজনের একটি বিশাল অংশকে দ্বীনি শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতার সৃষ্টি না করা যাবে এবং চিন্তা ও বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে গণজারণ ও বিপ্লবের সূচনা না করা যাবে সে পর্যন্ত আমাদেরকে গণতন্ত্রের এই তেতো শরবত পান করেই যেতে হবে।'

যে সময়, শ্রম, অর্থ ও মানুষকে এসব নির্বাচন ও ভোটের পেছনে লাগানো হচ্ছে, যেসমস্ত ইলমসম্পন্ন ব্যাক্তিরা এই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গঠন আর রাজনীতির পেছনে নিজেদের মেধা, সময় ও ইলমকে খরচ করছেন, তারা যদি এই সবকিছু গণতন্ত্রের ব্যাপারে এবং ইসলামী শাসনের আবশ্যিকতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা অজ্ঞতাকে দূর করা, তাদের মধ্যে সহীহ মানসিকতা তৈরি করা, সাধারণ লোকজনের একটি বিশাল অংশকে দ্বীনি শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতার সৃষ্টি করা, এবং চিন্তা ও বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে গণজারণ ও বিপ্লবের সূচনা করার জন্য কাজে লাগাতেন – তাহলে নিশ্চিতভাবেই মতের পার্থক্য হলেও এই তিক্ত তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হতো না। কারণ সাধারণ মানুষ ভোট দেয়াকে দ্বীনি দায়িত্ব মনে করার বদলে বিকল্প খোজাকে দ্বীনি দায়িত্ব মনে করতো। আর সহিহ মানসিকতা সম্পন্ন লোকের এই বিকল্প খুঁজে পেতে কুরআনের চেয়ে বেশি দূরে খুঁজতে হতো না।

উপসংহার

ইসলাম মানব জীবনের সফলতার জন্য একটি নিজস্ব, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ধারণা দেয়। আর ইসলামী জীবনের বিশেষ ধারা, দাবি ও চাহিদা আছে। অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ মেনে নিতেও ইসলাম রাজি না। ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই যেকোন যুগের বাতিল চাহিদাগুলোর ব্যাপারে ইসলাম তার অনুসারীদের ধৈর্য্য ধরে নিবৃত্ত হবার শিক্ষা দেয়। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট বাতিল চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিয়ে করার সক্ষমতা না থাকা অবস্থায় ইসলাম আমাদের মুত'আ কিংবা যিনা করার শরীয়াহসম্মত পদ্ধতি খুঁজে বের করতে বলে না, বরং রোজারাখা এবং ধৈর্য ধরার নির্দেশ দেয়।

প্রকৃত সমাধান হলো, এই ব্যবস্থা থেকে পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া এবং একে কুফর তথা জাহিলিয়্যাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। এই কুফর ও জাহিলিয়্যাহকে খতম করার জন্য অবস্থা ও মূলনীতির অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সাথে সাথে মানুষকেও এর জন্য প্রস্তুত করা। এটা না করে জাহিলিয়্যাহর ইসলামীকরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে বিকল্প দিতে দিতে একসময় অবধারিতভাবেই দ্বীনের রূপ পাল্টে যাবে।

যেমনটা উস্তাদ সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন –

"আল্লাহ্*র নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি হল হাকিমিয়্যাহ। যখনই কেউ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করে, তখনই সে নিজেকে আল্লাহর বদলে এমন আরেক প্রভুর ভূমিকাতে বসিয়ে নেয় যার আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। আর যারা এই আইন প্রণেতা বা আইন প্রণেতাগণের আনুগত্য করে, তারা আল্লাহ্*র গোলামের পরিবর্তে আইন প্রণেতাদের গোলামে পরিণত হয়। তারা অনুসরণ করে আইন প্রণেতাদের সৃষ্ট দ্বীনের, আল্লাহর দ্বীন ইসলামের না। জেনে রাখুন আমার প্রিয় ভাইরা, এটা আক্বিদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। এটা হল উলুহিয়্যাহ (একমাত্র আল্লাহ্*কে ইলাহ/উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা) এবং 'উবুদিয়্যাহর (একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব) প্রশ্ন। এটা হল ঈমান ও কুফরের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাহ এবং ঈমানের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাহ কোন নির্দিষ্ট সময় বা যুগ না, জাহিলিয়্যাহ হল একটি অবস্থা।"[সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ - ফী যিলাললিল ক্বুর'আন]

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বাস্তবতা বুঝার তাওফীক দান করুন। আমিন।

---

*সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াত এবং আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা থেকে কি বলপ্রয়োগের কারনে কুফর কাজ করা ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহন ও ভোট দেয়ার দলিল দেয়া যায়?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। (নাহল, ১০৬)

প্রথমত, এই উদাহরন মুখে কুফরি উচ্চারণের সাথে অর্থাৎ কথার সাথে সম্পর্কিত। কাজের সাথে না। বলপ্রয়োগের কারণে কুফর কাজ করার দলীল এখান থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না। বরং অনেক ফকীহ এমনও বলেছেন যে কুফরীর চেয়ে কম কাজের ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগের ওজর গ্রহণযোগ্য না। যেমন অনেকে বলেছেন যিনার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ গ্রহণযোগ্য ওজর না।

দ্বিতীয়ত, ইকরাহ এর সীমারেখা স্পষ্ট করতে হবে, এবং এটা ফকীহগণ স্পষ্ট করেছেন - এমন বলপ্রয়োগ যার কারণে প্রাণনাশের বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা থাকে অথবা এমন মারাত্মক নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে যাতে মৃত্যু বা অঙ্গহানি হতে পারে। এছাড়া বলপ্রয়োগ গ্রহনযোগ্য ওজর হবার আরো অনেক শর্ত বিভিন্ন মাযহাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভোট বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি এই পর্যায়ে ব্যাপারটা যাচ্ছে না। যেমনটা আগে বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই আয়াতে এবং আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কথা এসেছে। এই পুরো দাবির সম্পর্ক বলপ্রয়োগে বাধ্য করার সাথে। ভোট আর নির্বাচনের সাথে বলপ্রয়োগের ব্যাপারটা কিভাবে আসছে? আপনাকে-আমাকে, ১০ কোটী ৩০ লাখ ভোটারকে, নিজে নিজে মহাসোমারোহে মনোনয়নপত্র দিয়ে আসা লোককে কে বলপ্রয়োগে, প্রান কিংবা অঙ্গহানির আশংকায় ফেলে ভোট দিতে কিংবা নির্বাচন করতে বাধ্য করেছে? এখানে কিভাবে এই দলীল খাটানো যায়? যদি কেউ আসলেই ভোট না দিলে মারা যাবে (!) বা নির্বাচন না করলে মারা যাবে এমন অবস্থায় থেকে থাকে তবে তার কথা ভিন্ন হলেও হতে পারেও।

কাজেই গণতন্ত্র কুফরি ও শিরক মনে করলে এক্সট্রিম কিছু কেইস ছাড়া মন্দের ভালো – এর কথা বলে ভোট-নির্বাচনকে বৈধতা দেয়া যায় না। এবং এই আয়াত ও ঘটনাকে দলীল হিসবাএ ব্যবহার করা যায় না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৫৫